# প্র · যু · ক্তি

## সনাতন থেকে আধুনিক

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

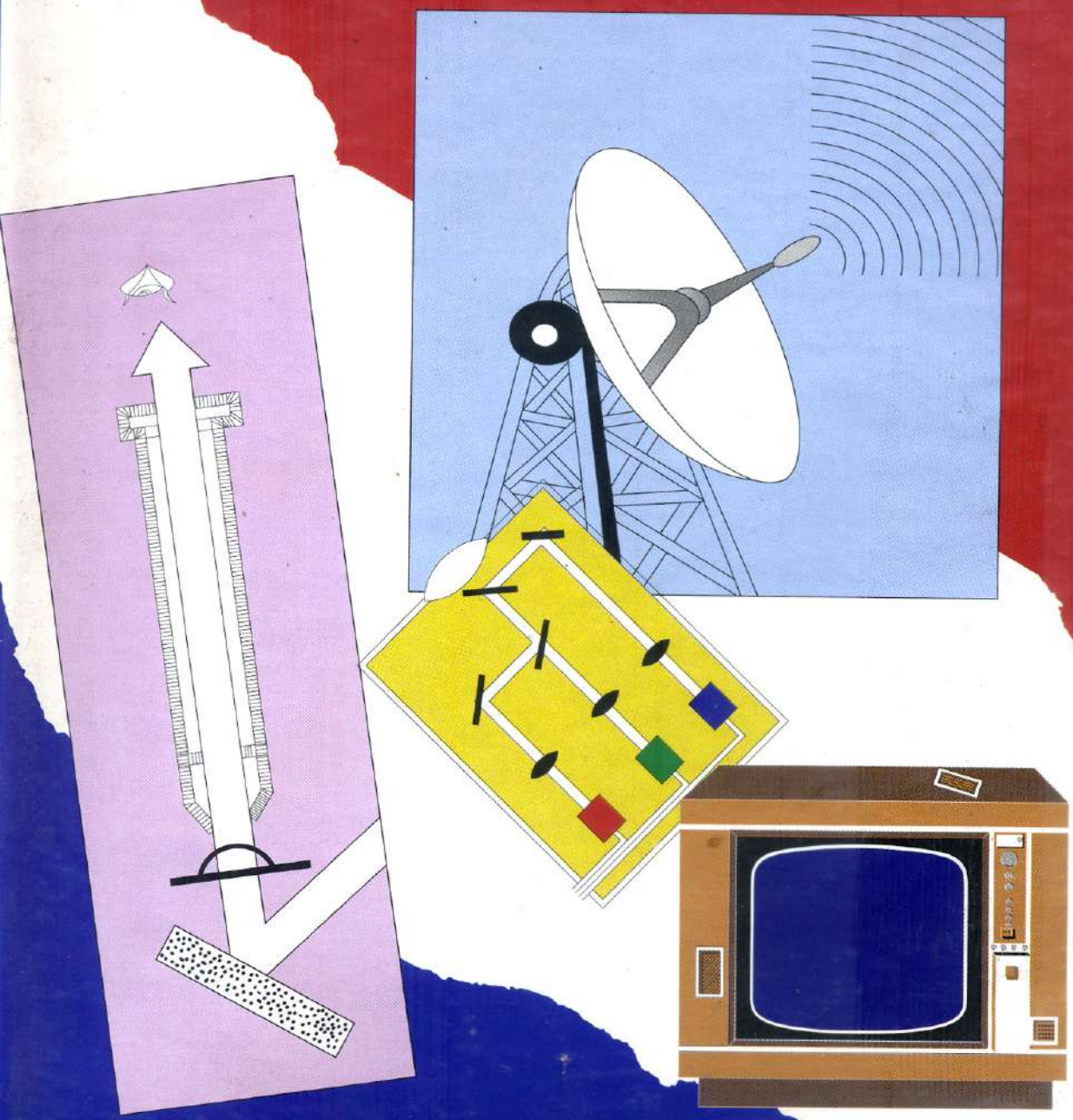

# প্রযুক্তি : সনাতন থেকে আধুনিক

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

## সূ চি প ত্র


টেলিভিশন প্রযুক্তির পালাবদল ৫

চশমা ৯

রঙিন ফটোগ্রাফি ১৩

ছাপাখানায় সনাতন ও বৈপ্লবিক ১৬

মাইক্রোওয়েভ ২৩

অপটিক্যাল ফাইবার ২৫

ব্যাটারির নয়া যুগ ২৭

আপনার ব্যাটারিকে চিনে নিন ৩২

অণুবীক্ষণ ৪০

খনিজ তেলের কূপ ৪৭

সৌরশক্তি : নানা কৌশল ৪৯

# টেলিভিশন প্রযুক্তির পালাবদল

বিশ্বকে একটি বাক্সের মধ্যে এনে দিয়েছে এই প্রযুক্তি—রঙিন, স্পষ্ট, তাৎক্ষণিক ছবিতে। তথাকথিত 'ছোট পর্দা' এখনো ছোট হলেও একেবারে ঐটুকু আর নেই। কিন্তু তবুও দর্শকের মন ভরে না। দর্শকের মন ভরলেও টেলিভিশন প্রযুক্তির উন্নয়নের পেছনে যাঁরা লেগে আছেন তাঁদের মন ভরে না। এর পালাবদলে এখন বড় চ্যালেঞ্জটির নাম এইচ ডি টিভি অর্থাৎ হাই ডেফিনিশন টেলিভিশন। এতে পর্দার ছবিটি এমন মসৃণভাবে গড়া সম্ভব যে, টেলিভিশন কাছে থেকে দেখলে ছবির মধ্যে লাইনের যে অন্তর্গঠন দেখা য়ায় তা আর দেখা যাবে না। আর এতে টেলিভিশন দেখার মধ্যে অন্য দ্যোতনা আসবে বইকী !

সিনেমার মজা টেলিভিশনে কখনো আসেনি, এর একটি কারণ এতে পর্দা ছোট। পর্দাকে খানিকটা প্রশস্ত করার পরও যতখানি কাছে বসলে দর্শকের পুরো দর্শনক্ষেত্র ও চেতনা জুড়ে এটি থাকতে পারত এত কাছে বসলে ছবির গড়নের সব দুর্বলতা ঘুচে আসেনি। এইচ ডি টিভি এটিই আনতে চাচ্ছে। জাপানে, যুক্তরাষ্ট্রে এবং ইউরোপে এখন এ নিয়ে দারুণ প্রতিযোগিতা চলছে। এইচ ডি টিভি তৈরি হয়েছে, প্রদর্শিতও হয়েছে, কিন্তু মানুষের ঘরে-ঘরে একে নিয়ে যেতে এখনো কিছু সমস্যা থেকে গেছে।

ইউরোপে উন্নত এইচ ডি টিভি বেশ ব্যাপকভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। বর্তমানে যে সাধারণ টেলিভিশন ব্যবস্থা তা জাপানের ও মার্কিন সিস্টেমে পর্দায় ৫২৫টি লাইনের সমন্বয়ে ছবি গড়ে তোলে, সেকেন্ডে এ-ছবির ৫০টি ফ্রেম চোখের সামনে দিয়ে যায়। ইউরোপীয় সিস্টেমে পর্দায় থাকে ৬২৫টি লাইন এবং সেকেন্ডে ছবির ফ্রেম যায় ২৫টি। যে-কেউ বেশি কাছে থেকে টিভি দেখলে এই লাইনগুলোর স্থূল প্রভাব এড়াতে পারবেন না। এইচ ডি টিভি একেই এড়িয়ে যাচ্ছে লাইনের সংখ্যা ১২৫০ অর্থাৎ দ্বিগুণে উন্নীত করে, এবং পর্দাকে আরো প্রশস্ত করে এইচ ডি টিভির বৈশিষ্ট্যগুলো বেশ সাফল্যজনকভাবেই সংযোজন করা সম্ভব হয়েছে। এর মাধ্যমে অত্যন্ত উন্নত মানের সিগন্যাল এখন সম্প্রচার করা যাচ্ছে। কিন্তু যেরকম টেলিভিশন সেটে এই উন্নত মানের সবটুকু ব্যবহার সম্ভব তা এখনো সহজে সস্তায় তৈরি সম্ভব হচ্ছে না।

এভাবে পিছিয়ে থাকার মূলে রয়েছে টেলিভিশন পর্দায় ব্যবহৃত প্রযুক্তির পশ্চাৎপদতা। এদিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে আছে যারা সেই জাপানিদের কথাই ধরা যাক। তারা এইচ ডি টিভি-র উপর কাজ শুরু করেছিল বছর বিশেক আগে। তারা এরকম টিভি সেট বাজারেও ছেড়েছে। কিন্তু তার প্রত্যেকটির দাম পড়ছে ত্রিশ হাজার ডলার! তা ছাড়া সম্প্রচার যতখানি উন্নত সিগন্যাল দিচ্ছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার ধারেকাছেও যেতে পারেনি এই সেটের মান। এরকম উন্নত টিভি সেট এখন দুই রূপে সম্ভব—এক হল অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পর্দার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেশ বড় একটি বাক্সের আকারে, অথবা

রিসিভার থেকে প্রজেক্টরের দ্বারা পর্দার উপর প্রক্ষিপ্ত করে। সাধারণ বৈঠকখানায় ব্যবহারের জন্য এই উভয়েই বেশ বেঢক জবড়জং ব্যাপার।

ছোট পর্দার মতো অপেক্ষাকৃত বড় পর্দারও প্রায় সব টিভি এখনো সি আর টি বা কেথোড রে টিউবের উপর নির্ভরশীল—টেলিভিশনের পিকচার টিউব যাকে বলা হয়। আমরা সেই বাক্সের মতো টিভিতে অভ্যস্ত যাতে একটি বড় সি আর টি থাকে যার প্রান্ত টিভি-পর্দার কাজ করে। প্রজেক্টারের মাধ্যমে পর্দায় ছবি প্রক্ষেপণ করে যে-ব্যবস্থা তাতে তিনটি অপেক্ষাকৃত ছোট সি আর টি ব্যবহৃত হয় যার একটি ছবির লাল অংশ, একটি নীল ও একটি সবুজ অংশ তৈরি করে। লেন্সের মাধ্যমে তিনটি অংশ এক করে পূর্ণাঙ্গ রঙিন ছবি সৃষ্টি করে তা পর্দার উপর প্রক্ষিপ্ত হয়। অস্বচ্ছ পর্দার উপর প্রক্ষেপণ করে প্রতিফলিত ছবি সিনেমার মতো দেখা যায়—অথবা অস্বচ্ছ পর্দার উপর প্রক্ষেপণ করে উলটো দিক থেকে তা দেখা যায় সাধারণ টেলিভিশনের মতো।

সি আর টি প্রযুক্তির বয়স এখন প্রায় শত বৎসর। এখনো যদিও এটি টিভি-র ক্ষেত্রে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী রয়ে গেছে তবু প্রযুক্তিটিতে বয়সের ছাপ স্পষ্ট। এই একশো বছরে এর উন্নয়ন অবশ্য প্রচুর হয়েছে—বলতে গেলে একে প্রায় আদর্শস্থানীয় করে তোলাও সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সর্বাধুনিক কালের ইলেকট্রনিক্সের অগ্রগতি যে-ধরনের চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে সেগুলোর তুলনায় সি আর টি কেমন যেন থুবড়ে পড়ছে। টেলিভিশনে সি আর টি-র, চেহারা হল একটি বেঢক বোতলের মত যার গলাটা বেশ লম্বা, কিন্তু ধড়টা হঠাৎ করে বড় ও চওড়া হয়ে একটি চ্যাপটা তলদেশের সৃষ্টি করেছে—সেটি আমাদের পর্দা। টিউবটির ভেতরটা বায়ুশূন্য থাকে। এ-অবস্থায় বাইরের বায়ুচাপ সহ্য করার জন্য একে যথেষ্ট পুরু মজবুত কাচ দিয়ে তৈরি করতে হয়, কিনারা ঘিরে ইস্পাতের বন্ধনী পরাতে হয়। পর্দাটা যত বড় হয়, এসব কারণে টিউবটিকে ততই বড় ও ভারী হয়ে পড়তে হবে। এ তো গেল বাইরের অবয়ব। টেলিভিশন টিউবে কার্যপ্রণালির পেছনে যে নির্মাণ প্রযুক্তি রয়েছে তাও যেন ঠিক আধুনিক হয়ে উঠতে পারছে না। টিউবের চ্যাপটা দেয়াল, যেটি টেলিভিশনের পর্দা, তার সারা গায়ে লাল, সবুজ আর নীল ফসফর বস্তুর ডট মোজেকের মতো ঘন সমাহারে প্রলেপ দেয়া থাকে। টিউবের সরু গলায় সৃষ্ট তিনটি ইলেকট্রন বিম এসে পর্দার উপর পড়ে। এর প্রত্যেকটি টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ছবির যথাক্রমে লাল, সবুজ ও নীল অংশের সিগন্যাল বহন করছে। ইলেকট্রন বিম ফসফর ডটগুলোতে আঘাত করলে ফসফরেসেন্স গুণের কারণে আলোর সৃষ্টি হয় ডট অনুসারে—লাল সবুজ বা নীল আলো। প্রত্যেকটি বীমকে যেতে হয় পর্দার কাছে তার সঙ্গে সমান্তরালে থাকা অনেকগুলো ছিদ্র-কাটা ধাতব পাতের ছিদ্রগুলোর মধ্য দিয়ে। ঐ পাতের ছিদ্র এমনভাবে কাটা থাকে যেন লাল সিগন্যালের বিম শুধুমাত্র লাল ডটগুলোর উপরই পড়তে পারে—সবুজ বা নীল ডটের উপরে নয়। কাজেই ছিদ্র ও ডট খুব সূক্ষ্মভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলতে হয়। তাই ছিদ্রকাটা ঐ পাতটিকেই ব্যবহার করতে হয় ডটের প্রলেপ দেবার সময় ছাঁচ হিসাবে। আবার ঐ ছিদ্রগুলোও কাটতে হয় একটি মূল ছাঁচ থেকে ফটো এচিং পদ্ধতিতে। ছিদ্র কাটা পাতটির ভিতর দিয়ে পর্যায়ক্রমে লাল, সবুজ ও নীল ডটের বাষ্প ঢুকিয়ে তা টিউবের চ্যাপটা দেয়ালে জমানো হয়। এই পুরো প্রক্রিয়ায় পাত এবং টিউবের দেয়ালকে একসঙ্গে নড়াচড়া করাতে হয়। এসবের ফলশ্রুতিতে সি আর টি বানাবার কারখানার রূপটি ধারণ করে ইলেকট্রনিক কারখানার মত নয়—বরং খানিকটা ভারী শিল্পের আদলে, আওয়াজে, জবড়জঙ্গতায়, ভারী ধাতু ও কাচের আদান-প্রদানে। হালকা ইলেকট্রনিক শিল্পের সুবিধা এখানে এখনো আসছে না।

ইলেকট্রন বিমগুলো লাইনে লাইনে বুলিয়ে গিয়ে অত্যন্ত দ্রুত পুরো পর্দাকে পরিক্রমণ করে, বারবার, সেকেন্ডে বহুবার। এই পরিক্রমণের কাজে বিমগুলোকে পরিচালিত করে ম্যাগনেটিক কয়েল। এই কয়েল বিমকে ডটগুলোর উপর ফোকাসে রাখে। কিনারার দিকে গিয়ে বিম যাতে ফোকাস না হারাতে পারে সেজন্য কয়েলের সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। পর্দার প্রশস্ততা বাড়ালে বিমকে দুপাশে অনেক বেশি যেতে হয় বলে এই নিয়ন্ত্রণও তখন কঠিন হয়ে ওঠে। তা ছাড়া প্রশস্ত পর্দার বড় টিভির একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হল সাধারণ টিভিতে প্রশস্ততা আর পেছনে থেকে পর্দা পর্যন্ত পুরুত্বের যে-অনুপাত সে-তুলনায় একে কম পুরু হতে হয়। নইলে পুরো বাক্স অত্যন্ত বেশি ঢাউস হয়ে পড়ে। সাধারণ টিভিতে এই অনুপাত ৪ ঃ ৩ হলেও প্রশস্ত পর্দার টিভিতে এটা রাখা হয় ১৬ ঃ ৯-তে, প্রশস্ততার তুলনায় পুরুত্ব এক্ষেত্রে কম। এর মানে বিমকে দুপাশে অনেক বেশি কড়া বাঁক নিতে হয় কিনারায় পৌছার জন্য। এ-ব্যবস্থা করতে গিয়ে ব্যয় অনেক বাড়ে। এ সবকিছুর কারণে সি আর টি-র উপর নির্ভরশীল টিভি সেট আপাতত ৩৬ ইঞ্চির (কোনাকুনি মাপে) বড় বাজারজাত করা হচ্ছে না—কারণ সেগুলো দামে, ওজনে আকারে এত বেশি হবে যে ব্যবহারের উপযুক্ত হবে না।

এইচ ডি টি ভি-র জন্য সি আর টি ডিজাইন করতে গিয়ে একটি উভয়সংকট হল ছবির মসৃণতা বাড়াতে গিয়ে ছবিকে মসৃণ করতে হলে ডটকে ছোট ও ঘন করতে হয়—পত্রিকার হাফটোন ছবিতে ডট ছোট হলে যেমন ছবি স্বাভাবিক হয় ডট বড় হলে ছবি কৃত্রিম মনে হয়। পর্দায় ডট ছোট রাখতে হলে ছিদ্রকাটা ধাতব পাতটির ছিদ্রকেও ছোট হতে হয়—অথচ আলোর উজ্জ্বলতা নির্ভর করছে ঐ ছিদ্র দিয়ে ইলেকট্রন বিমের কতখানি ঢুকতে দেয়া হল তার উপর। ছিদ্র বেশি ছোট হলে ডটের উজ্জ্বলতা কমে যায়। ছবিকে তখন অনুজ্জ্বল মনে হয়। আগে এইচ ডি টি ভি-র যতগুলো প্রদর্শন করা হয়েছে তার সবই হয়েছে অন্ধকার ঘরের মধ্যে। ছবির অনুজ্জ্বলতার কারণেই এটি করতে হয়েছে। স্বভাবতই নিজের ঘরে যাঁরা টিভি দেখবেন তাঁরা এভাবে অন্ধকারে তা দেখতে চাইবেন না। ইলেকট্রন বিমের তীব্রতা বাড়িয়ে সমস্যাটির একধরনের সমাধানের কথা কেউ-কেউ চিন্তা করছেন। কিন্তু তা করলে টিউবের আয়ুষ্কাল কমে যাবে। তা ছাড়া ছিদ্রকাটা ধাতবপাতটি তীব্র বিমের প্রভাবে এত বেশি গরম হয়ে পড়বে যে তা আকৃতি পরিবর্তন করে ছবির বর্ণবিন্যাসকে বিকৃত করে দিতে পারে।

সি আর টির এত সব সমস্যার কারণে সম্পূর্ণ নূতন নীতিতে টিভি পর্দার আয়োজন করা যায় কি না তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। বিকল্প পদ্ধতিগুলোর মধ্যে অগ্রবর্তী রয়েছে লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে (এল সি ডি)-নির্ভর পর্দা। এর গবেষণায় জাপানের শার্প কোম্পানি ইতিমধ্যে ৭০ কোটি ডলার ব্যয় করেছে, সানিয়ো করেছে ৫৬ কোটি ডলার আর প্যানাসোনিক ৩৫ কোটি। এল সি ডি হচ্ছে সেই একই পদ্ধতি যা আমরা ঘড়িতে বা ক্যালকুলেটরের ডিসপ্লেতে অহরহ দেখছি। এতে দুটি সমান্তরাল কাচপাতের মাঝখানে অত্যন্ত পাতলা ব্যবধানের (৫ মাইক্রোমিটার) মধ্যে বিশেষ গুণসম্পন্ন একরকম তরল দেয়া থাকে—একটি স্যান্ডউইচের মতো। পাত দুটির প্রত্যেকটির তলের সঙ্গে সাঁটা থাকে ধাতব তারের এক সূক্ষ্ম জাল—এত সূক্ষ্ম যে এরা স্বচ্ছ হয়। পাতদুটির কিনারায় থাকা মাইক্রোচিপের (কম্পিউটারের মূল অংশ) সঙ্গে এরা বৈদ্যুতিকভাবে সংযুক্ত থাকে। মাইক্রোচিপ সম্প্রচারিত টিভি সিগন্যালকে বৈদ্যুতিক পাল্‌সে পরিণত করে যা পাতের সঙ্গে সাঁটা তারজালের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। দুই পাশের তারের মধ্যে পাল্‌সের ভোল্টেজ অনুসারে মাঝখানের তরলের অণুগুলো বিন্যস্ত হয়। এটিই লিকুইড ক্রিস্টালের গুণ। এই বিন্যাসের ফলে হয় এরা আলোক গমনে বাধা দেবে নতুবা তাকে যেতে দেবে। তারজালের এক-একটি ক্ষুদ্র অংশ বা সেল এভাবে সেখানে আলোকিত বা

অনালোকিত ফোঁটা সৃষ্টি করবে। সবগুলো ফোঁটা মিলে গড়ে তোলে পুরো ছবি । কাচপাতের সঙ্গে লাল, সবুজ ও নীল ফিল্টারের সরু ফালি রঙিন ছবির ব্যবস্থা করে। তারজালের সঠিক সেলে আলাদা-ভাবে সঠিক সিগন্যালের পাল্‌সে আসতে হয় এবং সেখানে সঠিক রঙের ফিলটারটিও থাকতে হয়। এসব নিয়ন্ত্রণ করে ইলেকট্রনিক্সের কৌশল। এজন্য সারা পাতের উপর পাতলা স্বচ্ছ পর্দার আকারে অনেকগুলো ট্রানজিসটারে বিন্যাস রচনা হয়।

সব মিলে এল সি ডি কাচপাতের উপর স্তরে স্তরে দশ স্তর পর্যন্ত পরিবাহী, সেমি কন্ডাক্টর আর অপরিবাহী বস্তুর পাতলা আস্তরণ রচনা করতে হয়। এর মধ্যে কোথাও সামান্য খুঁত হলে পুরো পর্দাটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেল যত ছোট হবে ফোঁটাও ছোট হবে—কাজেই, ছবিও মসৃণ হবে। ছোট পর্দায় এটি অপেক্ষাকৃত বেশি সম্ভবপর। বড় পর্দার ক্ষুদ্র সেলের সংখ্যা এত বেশি হয় যে সেগুলোর সবকটাকে নিখুঁত রাখা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। একটি লাল, একটি সবুজ ও একটি নীল সেলের সমন্বয়ে গঠিত ছবির একটি ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয় একটি পিক্সেল। বর্তমান মানের একটি টিভির জন্য ছোট ১০ সেন্টিমিটার এল সি ডি পর্দায় এরকম এক লক্ষ পিক্সেল থাকবে। কিন্তু আরো সচরাচর প্রচলিত সাইজের পর্দায় পিক্সেলসংখ্যা হবে চার লক্ষ। এইচ ডি টিভি-র জন্য দরকার হবে ১৫ লক্ষ পিক্সেলের। এই ঘনত্বে এই সংখ্যায় সেলসহ এল সি ডি পর্দার ডিজাইন এখনো সম্ভব হয়নি।

ব্যবসায়িক ভাবে সি ডি পর্দা সম্ভব হয়েছে ছোট আকারের টেলিভিশনে। আশীর দশকের শুরুতে জাপানে এই প্রযুক্তি সাদা-কালো পকেট টেলিভিশন বাজারে ছাড়া হয়। এর পর এর একটি রঙিন সংস্করণও ছাড়া। কিন্তু উভয়ের কোনোটিই ব্যবসায়িকভাবে বেশি সফল হয়নি। দাম বেশি বলে এগুলো শুধু বিশেষ ব্যবহারেই কাজে লাগছে। বিশেষ ব্যবহারে এল সি ডি টেলিভিশনের বড় আকর্ষণ হল কেথোড রে টিউবের পাট চুকিয়ে দেয়া গেছে বলে এটি বেশ হালকা পাতলা হতে পারে। কতকটা একটি ফ্রেমে বাঁধা টাঙানো ছবির মতো করেই একে তৈরি সম্ভব। যেমন এরকম কৌশল ব্যবহার হয়ে থাকে দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বিমানে যেখানে ফিচার ফিল্ম ও বিনোদনের জন্য ছবি দেখানো হয়।

এল সি ডি পর্দা বড় করার সমস্যা তো রয়েছেই, তার উপর এর থেকে প্রাপ্ত ছবি এখনো তুলনামূলকভাবে নিষ্প্রভ। ঘড়ি বা ক্যালকুলেটরের ডিসপ্লে থেকেই এই নিষ্প্রভতা আমরা খানিকটা অনুমান করতে পারি। তবে এক্ষেত্রে কিছু আশার আলোও দেখা যাচ্ছে। সেটি এসেছে একটি সহজ কৌশল অবলম্বনে। এতে ছোট একটি এল সি ডি পর্দা সরাসরি দেখার কাজে ব্যবহৃত হবে না, এটি ব্যবহৃত হবে স্লাইড প্রজেকটারে দেয়া একটি স্লাইডের মতো। স্লাইডের মতোই এর মধ্য দিয়ে—উজ্জ্বল আলো প্রক্ষিপ্ত করে বড় পর্দার উজ্জ্বল ছবি পাওয়া যাবে। আসলে একটি স্লাইড নয়—ছবির লাল, নীল ও সবুজ অংশ নিয়ে তিনটি আলাদা আলাদা এল সি ডি 'স্লাইডে'র মধ্য দিয়ে আলোক আলাদাভাবে প্রক্ষিপ্ত হবে একই পর্দার উপর। এভাবে সৃষ্টি হবে উজ্জ্বল রঙিন ছবি। প্রত্যেকটি এল, সি ডি স্লাইডের আকার হবে মাত্র আড়াই সেন্টিমিটার যা খুব ভালো মানসম্পন্ন করে তৈরি সম্ভব । জাপানি গবেষকরা এখন এই পথেই এল সি ডির ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন। আর এল সি ডি-ই হয়তো শেষ পর্যন্ত এনে দিতে পারে টেলিভিশন প্রযুক্তির চূড়ান্ত পালাবদল যেখানে প্রশস্ত পর্দার এইচ ডি টিভি মানের উজ্জ্বল ছবি পাওয়া যাবে এমন টেলিভিশনে যা হালকা পাতলা ছিমছাম হবে, এবং যার দাম সাধারণ ক্রেতার আয়ত্তে থাকবে। আধুনিক ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির সঙ্গে সর্বাংশে মানানসই হবে বলেই এই নতুন প্রযুক্তির সাফল্য-সম্ভাবনা অধিক।

# চশমা

বলা হয় বাতাসের মধ্যে বাস করে আমরা বাতাসের অস্তিত্বের কথা ভুলে যাই। একই মন্তব্য করা যায় যারা অনেক কাল ধরে সার্বক্ষণিকভাবে চশমা ব্যবহার করে তাদের সম্বন্ধেও। ওটা শরীরের এমন অঙ্গ হয়ে পড়ে যে, তার অস্তিত্বই বেমালুম ভুলে থাকা যায়। অথচ এই ছোট সাহায্যকারীটি না থাকলে আমাদের অনেকের জীবনটা যে কীরকম অসম্পূর্ণ হত তা ভাবতেই ভয় লাগে!

চশমার জন্য চাই লেন্স। কাচ থেকে লেন্স তৈরির বিদ্যাটি অতি প্রাচীন। ক্রিট দ্বীপে পাথুরে ক্রিস্টাল কাচের তৈরি এমন দুটি লেন্স পাওয়া গেছে যেগুলিকে খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দেরও আগের বলে ধারণা করা হচ্ছে। সাহিত্যে লেন্সের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় খ্রিস্টপূর্ব ৪৩৪ অব্দে লেখা এরিস্টোফেনেসের গ্রিক নাটক 'মেঘের কমেডি' নামক বইতে। আরব বিজ্ঞানী আল হাসান একাদশ শতাব্দীতে আলোকবিদ্যার উপর যে বিশদ গ্রন্থ রচনা করেন তাতে লেন্স ও প্যারাবোলিক আয়নার সাহায্যে কোনো জিনিস বড় করে দেখার নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ ছিল। পরবর্তী সময় রোজার বেকন (ত্রয়োদশ শতাব্দী) এবং দেকার্তে (সপ্তদশ শতাব্দী) প্রতিসরণের নিয়মগুলো সুসংবদ্ধ করেন।

চশমার ব্যবহারের সবচেয়ে পুরনো সাক্ষ্য পাওয়া যায় ফ্রান্সের একটি গির্জার মহাফেজখানায়। সেখানে ১২৮২ সালের এক দলিলে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরে জনৈক যাজককে চশমার ব্যবহার করতে দেখা যায় ইটালিতে ১৩৫২ সালে আঁকা একটি ছবিতে। কিন্তু সেই ছবিতে দেখানো চশমাটা পরতে হলে বেশ উঁচু নাকের প্রয়োজন!

প্রথম আমলের চশমাগুলো প্রায়ই তৈরি হত দুই টুকরা চামড়ার উপর লেন্স লাগিয়ে, যা কপালের উপর নিচে করে পরা টুপির সাথে লাগানো থাকত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ইস্পাতের স্প্রিং দিয়ে আঁটা চশমার প্রচলন হয়। ১৭২৮ সালের এক বর্ণনায় নাকে আঁটা ও দুপাশে ফ্রেম দেওয়া চশমার ব্যবহার দেখা যায় বটে কিন্তু সেই ফ্রেম কানে লাগাবার উপায় তখন ছিল না—সেকালের ইউরোপে জবড়জং টুপি-পরচুলার দৌরাত্ম্যে। সেই চশমা কপালের দুপাশে চাপ দিয়ে রাখা হত। প্রথম দিকে কোয়ার্টজ ক্রিস্টালের লেন্স দিয়ে চশমা তৈরি হত, কারণ এ-কাজের উপযুক্ত গুণসম্পন্ন কাচ তখন মিলত না। পরে অবশ্য উন্নত কাচ তৈরির সাথে সাথে চশমায় সস্তা কাচের ব্যবহার সম্ভব হয়।

চশমার লেন্সের বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে আলোকবিদ্যার কয়েকটি বিষয় লক্ষ করা প্রয়োজন। লেন্স কনভেক্স বা স্ফীতোদর অথবা কনকেভ বা ক্ষীণোদর হতে পারে। লেন্সের দুটি তলই কনভেক্স হলে তাকে বাইকনভেক্স এবং দুটিই কনকেভ হলে তাকে বাইকনকেভ বলা হয়। কনভেক্স লেন্স বিম্বকে বিবর্ধিত করে এবং কনকেভ লেন্স তাকে হ্রাসকৃত করে। চোখের ফোকাস-বিন্দু স্বাভাবিকের চেয়ে দূরে চলে গেলে, কাছের জিনিস দেখার জন্য কনভেক্স লেন্সের প্রয়োজন হয়। এরকম ক্ষেত্রে চোখের অসুবিধাটাকে বলা হয় হাইপারমেট্রোপিয়া। আবার দূরের জিনিসে চোখকে ফোকাস করতে অসুবিধা

হবার নাম মাইয়োপিয়া। এক্ষেত্রে কনকেভ লেন্স ব্যবহার করে ফোকাস-বিন্দুকে দূরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হয়। প্রথমোক্ত চশমাকে পজিটিভ পাওয়ার চশমা এবং দ্বিতীয় প্রকারের চশমাকে নেগেটিভ পাওয়ারের চশমা বলা হয়।

সাধারণ লেন্সের কতগুলো ত্রুটি অন্তর্নিহিত থেকে যায়। এর একটি হল ক্রোমেটিক এবেরেশন বা রং-সংক্রান্ত ত্রুটি। সাদা আলোর মধ্যে যে বিভিন্ন রঙের আলো থাকে লেন্সে তারা বিভিন্ন পরিমাণে বাঁকে বলে রংগুলো বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ার প্রবণতা থাকে। বেগুনি রং বাঁকে সবচেয়ে বেশি, আর লাল বাঁকে সবচেয়ে কম। রং-সংক্রান্ত নয় এমন ত্রুটির সংখ্যা হল পাঁচটি—গোলকাকৃতি ত্রুটি, কমা, এসটিগমেটিজম, ক্ষেত্রের বক্রতা এবং বিকৃতি।

চশমার লেন্সে অপেক্ষাকৃত পাতলা এবং এর ছোট একটা এলাকাই চোখের দেখার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই দুই কারণে লেন্সের সব ত্রুটি এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। গোলাকাকৃতি ত্রুটিকে কমাবার জন্য চশমার লেন্সকে তার ফোকাস-দূরত্ব পরিবর্তন না করে বাঁকিয়ে নেওয়া হয়। এরকম বাঁকানোর ফলে চোখের পাতার জন্য সামনে খানিকটা জায়গাও থেকে যায় চশমাতে। 'কমার' ত্রুটিটা দেখা দেয় যখন লেন্সের অক্ষরেখা থেকে দূরের কোনো বিন্দু থেকে আলো এতে ঢোকে। আলো অনুসারে চোখের ছিদ্র-নিয়ন্ত্রণকারী আইরিসের কারণে চশমার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ নয়।

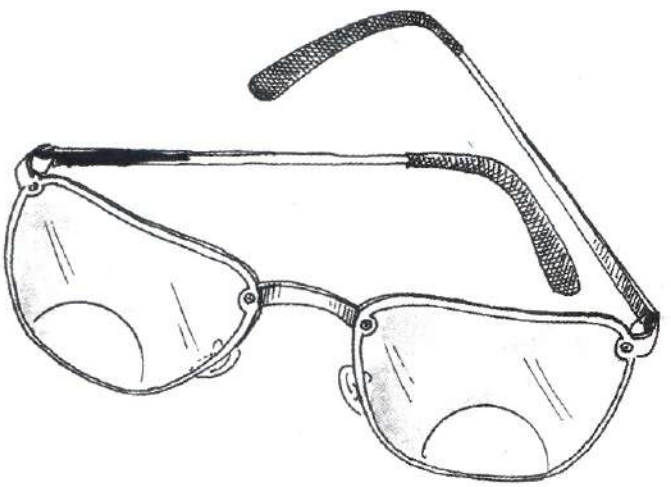

*বাইফোকাল চশমা*

এসটিগমেটিজম এবং ক্ষেত্রের বক্রতার ফলে লেন্সের কিনারা দিয়ে আসা আলোয় ফোকাস পরিবর্তিত হয়ে যায়। কাজেই এই দুটি ত্রুটি চশমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এসটিগমেটিজম ঠিক করার জন্য গোলক ও বেলনাকৃতির (সিলিন্ডা আকৃতির) লেন্সের সমন্বয় ঘটাতে হয়। আর ক্ষেত্রের বক্রতা কমানোর জন্য লেন্সকে সঠিক পরিমাণে বাঁকিয়ে নিতে হয়। বিকৃতি নির্ভর করে লেন্সের কার্যকর এলাকার আয়তনের উপর। চশমার ক্ষেত্রে এই ত্রুটিটিকে নগণ্য বলে ধরে নেওয়া যায়।

লেন্সের পাওয়ার মাপা হয় ডায়োপটার নামক এককে। এক ডায়োপটার হল সেই লেন্সের পাওয়ার যার ফোকাস-দূরত্ব এক মিটার। আগেই বলা হয়েছে হাইপারমেট্রোপিয়া অর্থাৎ কাছে দেখার অসুবিধার জন্য প্লাস পাওয়ারের এবং মায়োপিয়া অর্থাৎ দূরে দেখার অসুবিধার জন্য মাইনাস পাওয়ারের লেন্স

ব্যবহার করতে হয়। লেন্সের পাওয়ার নির্ভর করে তার উভয় তলের বক্রতার পার্থক্যের উপর এবং তার কাজের প্রতিসরণাংকের উপর। লেন্সের কেন্দ্রভাগের পুরুত্বের উপরও অবশ্য পাওয়ার খানিকটা নির্ভর করে।

আমাদের চোখ সূক্ষ্ম জিনিসগুলো আলাদা করে কতখানি চিনতে পারে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গেছে যে, আড়াআড়ি কালো ও সাদা রেখা একের নিচে এক থাকলে সেগুলো চোখ ততক্ষণ পর্যন্ত আলাদা করতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত একটি রেখার উপর-নিচ থেকে আগত রেখা চোখের রেটিনায় অন্তত আধ মিনিট (৬০ মিনিট = এক ডিগ্রি) একটি কোণ উৎপন্ন করে মিলিত হয়। এর চেয়ে ছোট কোণ উৎপন্ন করলে রেখাগুলো সাধারণত আলাদা করা সম্ভব হয় না। চোখের দৃষ্টিক্ষমতা পরীক্ষার জন্য ডাক্তাররা স্নেলেন চার্ট নামক বিভিন্ন আকারের অক্ষরের একটি চার্ট ব্যবহার করেন। এটি ১৮৬২ সাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে সাধারণত ৭ সারিতে বিভিন্ন রোমান বড় হাতের অক্ষরগুলো দেওয়া থাকে। আবার উপরের সারিতে থাকে সবচেয়ে বড় আকারের অক্ষর এবং সবার নিচেরটায় সব চেয়ে ছোট আকারের। চার্টটি আলোকিত ঘরে রাখা হয়, অথবা স্বচ্ছ কাচে একে পেছন থেকে আলো দেবার ব্যবস্থা করা হয়। একে ২০ ফুট দূর থেকে পড়তে হয়। কখনো কখনো জায়গা কম খরচের জন্য আয়নার মধ্য দিয়ে পড়ে সত্যিকার দূরত্বকে অর্ধেকে নামিয়ে আনা হয়।

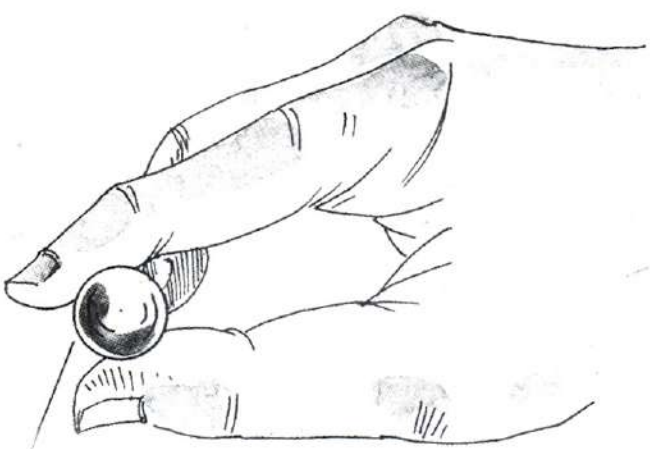

*কনটাক্ট লেন্স*

সাদা পটভূমিতে কালোতে অক্ষরগুলো আঁকা হয়। একই সারির প্রত্যেকটি অক্ষর সমান কারণ এদের প্রত্যেককে পাঁচ সমান ভাগে বিভক্ত বাহুর একটি বর্গের মধ্যে আঁকা হয়। অক্ষরের আকার এমন হয় যেন এর মোট উচ্চতা বা প্রশস্ততা নির্দিষ্ট দূরত্বে (যা সারির উপর লেখা থাকে) ৫ মিনিট পরিমাণ কোণ উৎপন্ন করে। আর এর রেখার প্রশস্ততা ঐ দূরত্বে ১ মিনিট কোন উৎপন্ন করে। যে একদম শেষ সারির অক্ষরও ভালো দেখতে পাবে তার দৃষ্টির সূক্ষ্মতা হয় ১ যাকে স্বাভাবিক ধরা হয়। আবার যে শুধু প্রথম সারিই দেখতে পায় তার ১০ ভাগের ১ ভাগ। অনেকের অবশ্য ১-এর চেয়েও ভালো সূক্ষ্মতা দেখা যায়, যা ১.৫ বা ১.৭৫ পর্যন্ত হতে পারে। চশমার প্রয়োজনীয়তা নির্ণয়ের জন্য স্নেলেন চার্ট অপরিহার্যভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

চশমার কাচকে খুব বিশুদ্ধ এবং দাগ ও বুদবুদমুক্ত অবস্থায় পাওয়া চাই। নইলে আলোর চলাচলে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। একে অপেক্ষাকৃত কম ভঙ্গুর করার জন্য তাপ ও চাপ প্রয়োগে অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দৃঢ় করে নেওয়া হয়। আজকাল চশমায় এমন কাচও ব্যবহার করা হয় যা আলোর তীব্রতা বাড়লে আপনা থেকেই গাঢ় ধারণ করে— এদের বলা হয় ফটোক্রোমিক কাচ। ১৯৬৪ সনে এরকম কাচ প্রথম উদ্ভাবিত হয়। অপ্রয়োজনীয় আলোর ধাঁধা এবং ক্ষতিকর আলট্রা ভায়োলেট আলো কমাবার জন্য সান-গ্লাসে বিশেষভাবে প্রস্তুত পাতলা পোলারয়েড লেন্স ব্যবহার করা হচ্ছে বেশ কিছুদিন থেকে। কিন্তু ১৯৭৩ সাল থেকে সাধারণ প্রেসক্রিপশনে দেওয়া চশমাতে ব্যবহারের জন্যও পোলারয়েড কাচ পাওয়া যাচ্ছে। এতে আলোর ধাঁধা শতকরা ৯৯ ভাগ এবং আলট্রা ভায়োলেট ৯৬ ভাগ ঠেকিয়ে রাখা যায়।

চশমার কাচকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়— সিঙ্গল ভিশন অর্থাৎ এক-দৃষ্টির, এবং মালটি ফোকাস বা একাধিক ফোকাসসম্পন্ন। যদিও ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুসারে কাচের বিভিন্নতা অসংখ্য রকমের হতে পারে, তবুও অধিকাংশের উপযুক্ত কাচ বেশ কিছু বৈচিত্র্যের মধ্যে আগেই তৈরি করে রাখা সম্ভব। সিঙ্গল ভিশন লেন্সকে মেনিস্কাস ও টোরিক এই দুই আকৃতিতে পাওয়া যায়। সামনের দিকে বাঁকা মেনিস্কাস লেন্সের কথা আগেই বলা হয়েছে। সাধারণতঃ ৮.০০ থেকে + ৭.০০ পাওয়ারের মেনিস্কাস লেন্স মজুদ রাখা হয় ০.২৫D পরপর পাওয়ারে। টোরিক লেন্স হচ্ছে গোলকাকৃতি পাওয়ারের সাথে বেলনাকৃতি (সিলিন্ড্রিক্যাল) পাওয়ার-সংযোজিত লেন্স। টরোয়ডাল স্ফিয়ার নামে জ্যামিতিক আকৃতি থেকে কেটে নেওয়া হয় বলেই এর এই নাম। এতে সাধারণত ০ থেকে ০.২৫ পরপর সর্বোচ্চ ৪.০০ পর্যন্ত বেলনাকার পাওয়ার দেওয়া হয় ; অন্য পাওয়ারের সঙ্গে সঙ্গে।

একাধিক ফোকাসের লেন্সে একই কাচখণ্ডে তৈরি হতে পারে, অথবা বিভিন্ন কাচখণ্ডকে একত্রে জুড়েও হতে পারে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় বাইফোকাল লেন্স যা দুটি ফোকাসসম্পন্ন—একটি কাছের জিনিস দেখাতে, একটা দূরের জিনিস। সাধারণ-জুড়ে দেওয়া বাই ফোকাল লেন্সে প্রধান লেন্সটি তৈরি হয় ক্রাউন কাচে আর তার মধ্যে অল্প একটু অংশ কেটে নিয়ে ওখানে জুড়ে দেওয়া হয় ফ্লিন্ট কাচের অন্য লেন্সের অংশ। এই দুই কাচের প্রতিসরণাঙ্কের পার্থক্যের ফলেই উভয়ের ফোকাস-দূরত্বে পার্থক্যটা সৃষ্টি হয়। জুড়ে-দেওয়া বাইফোকালে কিছু অসুবিধার কারণে আজকাল এক খণ্ডে তৈরী বাইফোকাল বেশ জনপ্রিয়। এতে ক্রাউন কাচে তৈরি একই লেন্সের বিভিন্ন অংশে ঘর্ষণ ও পলিশিং-এর সময় বিভিন্ন পাওয়ার সংযোজন করা হয়। এভাবে পুরো লেন্স ক্রাউন কাচে তৈরি সম্ভব হয়, যার বর্ণ-সংক্রান্ত ত্রুটি কম এবং যাতে দাগ বা আঁচড় পড়ার সম্ভাবনাও কম।

আমরা যখন চক্ষুবিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে চোখ দেখাই, তখন তিনি প্রয়োজনে চশমার ব্যবস্থাপত্র দেন। এতে চশমার প্রয়োজনীয় গোলকাকৃতি ও বেলানাকৃতি পাওয়ার উল্লেখ করা থাকে। তা ছাড়া থাকে এর অক্ষের অভিমুখ, শীর্ষবিন্দুর (ভারটেক্স) দূরত্ব, রঙের আভা ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরনের লেন্সে পরিবর্তনযোগ্য চশমা চোখের সামনে ধরে সাধারণত ব্যবস্থাপত্র স্থির করা হয়।

চশমার রাজ্যে আর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সদস্য হল কন্টাক্ট লেন্স যা চোখের মণিতে সেঁটে থাকে। এটা একটা ছোট প্লাস্টিকের লেন্স। যারা সাধারণ চশমার ভার বহনে অনিচ্ছুক তাদের জন্য তো বটেই, এমনিতেও কন্টাক্ট লেন্সের অনেক সুবিধা রয়েছে। সাধারণভাবে এরা চশমার চেয়ে বৃহত্তর দৃষ্টির ক্ষেত্র দেয়, দৃষ্টির ত্রুটিও আসে কম। তবে ব্যয়বহুল বলে অন্তত আমাদের দেশে এর জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ।

# রঙীন ফটোগ্রাফী

বহুকাল যাবৎ মানুষ চারপাশের রঙিন জগৎটিকে ক্যামেরার মাধ্যমে ছবিতে ধারণ করতে চেয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষম রঙিন ফটোগ্রাফি উদ্ভাবন করা সহজ হয়নি। বহু উদ্ভাবকের অবদান এতে প্রয়োজন হয়েছে। রঙিন ফটোগ্রাফির কৌশল বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে রং আমরা কীভাবে দেখি। আমাদের চোখের পেছনে আলোকসংবেদী রেটিনায় রয়েছে তিনটি পৃথক উপাদান যার প্রত্যেকটি একটি করে রঙে সাড়া দেয়। একরকম উপাদান সাড়া দেয় নীল আলোতে, অন্যরকম উপাদান সবুজ আলোতে এবং তৃতীয় আর এক রকম উপাদান লাল আলোতে। এই তিনটিকে বলা হয় প্রাথমিক রং। এই তিনটির সঠিক মিশ্রণে অন্য যে-কোনো রং সৃষ্টি করা সম্ভব।

উদারহণস্বরূপ, হলুদ হল লাল আর সবুজের মিশ্রণ। রেটিনার সেই উপাদানগুলো এর উপর আপতিত হলুদ আলো থেকে লাল আর সবুজের অংশটিতে আলাদাভাবে সাড়া দেয়। পরে মস্তিষ্কে এই দুয়ের সংমিশ্রণে হলুদের অনুভূতি জন্মে। রঙিন ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রেও এই নীতিটিই কাজ করে।

১৮৬১ সালে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ব্রিটেনের রয়্যাল সোসাইটির এক সভায় প্রথম একধরনের রঙিন ফটোগ্রাফির প্রদর্শন করেন। নানা বর্ণে রঙিন একটি ফিতায় তিনি তিনবার ছবি তোলেন। প্রথম বার তোলেন কাচপাত্রে রাখা নীল তরলের ভেতর দিয়ে, দ্বিতীয় বার সবুজ তরলের ভেতর দিয়ে এবং শেষবার লাল তরলের ভেতর দিয়ে। ফলে প্রত্যেকটিতে একটি রং ছাড়া বাকিগুলোর আলো বাদ পড়ে যাচ্ছে। রঙিন তরল এখানে কাজ করছে আলোর একটি ফিল্টার বা ছাকনি হিসাবে। প্রত্যেকবারের নেগেটিভ থেকে তিনি একটি করে স্লাইড তৈরি করেন স্লাইড প্রজেক্টারের সাহায্যে যার ছবি পর্দায় প্রক্ষেপণ করা যায়। তিনটি প্রজেক্টার তিনটি স্লাইড থেকে ছবি পর্দার একই অঞ্চলে প্রক্ষিপ্ত করে। যেই স্লাইড তুলতে ক্যামেরার সামনে সবুজ তরল ব্যবহার করা হয়েছিল তার প্রজেক্টারের সামনে রাখা হল সবুজ তরল। তেমনি অন্য দু'টির সামনে রাখা হল নীল ও লাল তরল। তিনটি ছবির মিলিত ফল হল মূল ফিতাটি তার সব বর্ণসমারোহ নিয়ে পর্দায় ধরা দিল।

এই একই প্রক্রিয়াকে পরে একটিমাত্র সংবেদনশীল পাতে সন্নিবেশ করা সম্ভব হল। এখানে আলোকসংবেদী সিলভার ইমালশনের উপর তিন সেট ক্ষুদ্র রঙিন ফোঁটা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ফোঁটাগুলো কাজ করে সেই রঙিন তরলের ফিল্টারের মতো, শুধু একটি রঙের অংশকে যেতে দিয়ে। এভাবে ছবির বিভিন্ন রঙের মধ্যে নীলরঙের অংশটুকু নীল ফোঁটার মধ্য দিয়ে গিয়ে আলোকসংবেদী সিলভার ইমালশনে প্রভাব ফেলতে পারে। সবুজ ও লাল ফোঁটার ক্ষেত্রেও একই রকম ঘটে। এভাবে রঙের তিনটি প্রাথমিক অংশ তিন রকমের ফোঁটার পেছনে গিয়ে ফিল্মের উপর কাজ করবে। ফিল্মটিকে প্রস্ফুটিত করলে এবং পজিটিভে রূপান্তরিত করলে যেখানে নীল ফোঁটার উপর নীল আলো পড়েছে সেখানে আলোকে বাধা দেবার মতো সিলভার কণা থাকবে না। ফলে আলোর সামনে ধরলে নীল ফোঁটার ভেতর দিয়ে নীল আলো চলে যেতে পারে পর্দায়। এমনি করে নীল, সবুজ এবং লাল আলোর বহু ফোঁটা পাশাপাশি থেকে সংমিশ্রিত সব রঙের অনুভূতি আমাদের কাছে ফুটিয়ে তুলতে পারে।

রঙিন ছবি সৃষ্টি করার এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় যৌগিক প্রক্রিয়া, কারণ তিনটি প্রাথমিক রঙের ছবিকে একযোগে দেখার ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের যৌগিক প্রক্রিয়ায় ভালো ফটো পাওয়া সম্ভব হলেও এর একটি মৌলিক ত্রুটি রয়েছে। বিভিন্ন ফোঁটার ভেতর দিয়ে আলো যাওয়া ছাড়া বাকি অংশ আলোর প্রতি অস্বচ্ছ থেকে যায়। এই অস্বচ্ছ অংশের মোট ফল হয় ছবির ঔজ্জ্বল্য কমিয়ে ফেলা এবং স্লাইড প্রজেক্টরে প্রক্ষেপণের জন্য অধিক তীব্র আলো প্রয়োজন হওয়া। তা ছাড়া এই ছবি মূলত অনেকগুলো ফোঁটার সমষ্টি বই কিছু নয়। ছোট ছবিতে ফোঁটাও ক্ষুদ্র থাকে বলে সেগুলো আলাদা করে ধরা পড়ে না। কিন্তু অতিরিক্ত এনলার্জ করা ছবিতে এরা ধরা পড়ে যায় এবং ফোঁটার প্যাটার্নটি স্পষ্ট হয়ে ছবির মসৃণতা নষ্ট করে।

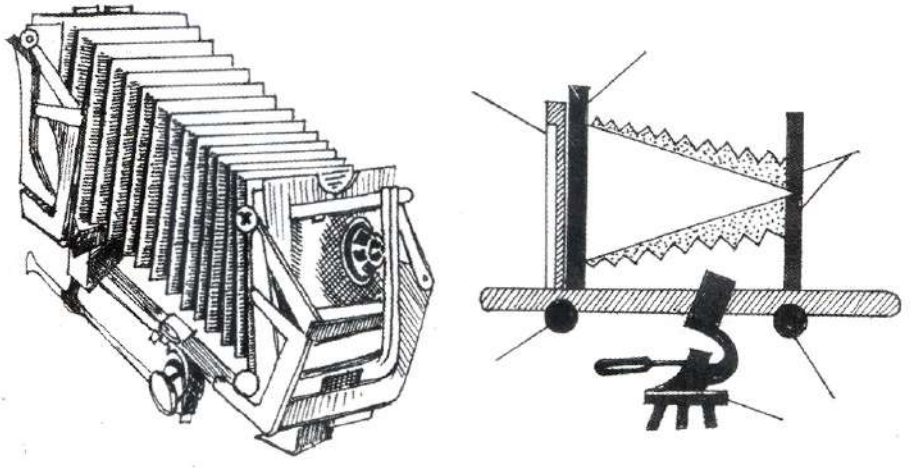

*আগেকার দিনের একটি ক্যামেরার বিভিন্ন অংশ*

এই কারণে আধুনিক রঙিন ফটোগ্রাফিতে সাধারণত অন্য একটি প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়, যাকে বলা যেতে পারে বিয়োজন প্রক্রিয়া। এর জন্য যে-ফিল্ম ব্যবহৃত হয় তাতে পরপর তিনটি আলোকসংবেদী স্তর থাকে, এর প্রত্যেকটি একটিমাত্র প্রাথমিক রঙের প্রতি সাড়া দেয়। প্রথম স্তরটি নীল রঙের প্রতি, দ্বিতীয়টি সবুজ রঙের প্রতি এবং তৃতীয়টি লাল রঙের প্রতি সাড়া দেয়। সমস্যা দাঁড়ায় এমন কোনো ফিল্ম ইমালশন তৈরি করা কঠিন যা সবুজ রঙের প্রতি সংবেদী হবে অথচ নীল রঙের প্রতি মোটেই সাড়া দেবে না। তাই নীল ও সবুজ সংবেদী দুটি স্তরের মাঝখানে একটি হলুদ ফিল্টার দিয়ে দেয়া হয় যাতে কোনো নীল রঙের আলো সবুজ স্তরে গিয়ে না পৌঁছাতে পারে।

ফটো তোলার সময় ছবির নীল অংশ, সবুজ অংশ এবং লাল অংশ বিভিন্ন স্তরে ধরা পড়ে। প্রথমে এ-ফিল্মকে যখন প্রস্ফুটিত করা হয় তখন তিন স্তর থেকেই একধরনের সাদা-কালো প্রস্ফুটন ঘটে। যেমন, যেখানেই লাল আলো লাল স্তরে পড়েছে সেখানেই কালো সিলভারকণার সঞ্চয় ঘটবে সাধারণ সাদা-কালো প্রস্ফুটনের মতো। অন্য দুই স্তরেও একই প্রকার ঘটে। এই প্রস্ফুটিত ফিল্ম থেকে একটি

পজিটিভ তৈরি করে নেওয়া হয়, তাও তিন স্তরবিশিষ্ট ফিল্মে। তারপর আসে রঙিন-প্রস্ফুটনের পালা। এই প্রস্ফুটন ঘটে স্তরে স্তরে। নীল-সংবেদী স্তরকে হলুদ রঞ্জকদ্রব্য দিয়ে রাঙিয়ে তোলা হয়। সবুজ সংবেদী স্তরকে ম্যাজেনটা দিয়ে এবং লাল সংবেদী স্তরকে সিয়ান বা নীলচে-সবুজ রঞ্জক দিয়ে রাঙানো হয়। এর পর সিলভারকণাগুলো দ্রবীভূত করে ফেললে যেসব জায়গায় এতক্ষণ সিলভারকণার সঞ্চয় ছিল তা রঙিন হয়ে পড়বে। আর বিভিন্ন অংশে থাকবে বিভিন্ন রং।

আসলে রাঙানোর কাজটি করা হয়েছে মূল প্রাথমিক রংগুলোর পরিপূরক রং দিয়ে। নেগেটিভে নীল রঙের জন্য যে-অংশ কালো হয়েছিল পজিটিভে ওটা সাদা হয়ে গিয়ে বাকি অংশ কালো হয়েছে। এখন রঙিন প্রস্ফুটনে সেই বাকি অংশ রঙহীন। নীলের পরিপূরক হলুদ সেখানে নেই। কিন্তু অন্য দুই স্তরের সিয়ান আর ম্যাজেনটা রঞ্জক বস্তু এখানে একত্রে নীলটা রেখে অন্য সব রং শোষণ করে নেবে। ফলে এই অংশ থেকে শুধু নীল রংই প্রক্ষিপ্ত হবে যেমনটি ছিল মূল ছবিতে। এভাবে নীল ছাড়া অন্য সব রং বিয়োজিত হয়ে নীল সৃষ্টি হচ্ছে বলেই একে বিয়োজন-প্রক্রিয়া বলা হয়। এমনি করে হলুদ আর ম্যাজেনটার দ্বারা লাল, এবং সিয়ান আর হলুদের দ্বারা সবুজ প্রক্ষিপ্ত হয়। সাদা অংশ হবে যেখান থেকে তিন স্তরের সব সিলভারকণা ধুয়ে গেছে সেই স্বচ্ছ এলাকায় আর কালো হবে যেখানে তিনটি রঞ্জকবস্তুই একের উপর এক একই জায়গায় পড়েছে সেখানে।

প্রক্ষেপণের স্বচ্ছ ফটোর ভেতর দিয়ে আলো নিয়ে গিয়ে একই রকম তিন স্তরবিশিষ্ট কাগজের বা প্লাস্টিকের ফিল্মে ফেলে রঙিন প্রিন্ট পাওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে একেও একই পদ্ধতিতে রঙিন প্রস্ফুটন করতে হয়।

স্পষ্টত রঙিন ছবির প্রস্ফুটন-প্রক্রিয়া সাদা-কালো ছবির চাইতে অনেক বেশি জটিল। একসময় আমাদের দেশে এটি করার ব্যবস্থা আদৌ ছিল না। ছবি তুললেও তা বিদেশে পাঠাতে হত প্রক্রিয়াকরণের জন্য। বহু বছর হল এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। রঙিন ছবি প্রস্ফুটনের ব্যবস্থা এখন দেশে অনেক জায়গাতেই রয়েছে। তাই রঙিন ছবি তোলা এখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, এর কিছুটা ব্যয়বহুলতা সত্ত্বেও।

রঙিন ছবি তোলা সাদা-কালো ছবি তোলার মতোই সহজ। তবে এর জন্য কয়েকটি কথা মনে রাখা ভালো। সাধারণত সাদা-কালো ফিল্মের তুলনায় রঙিন ফিল্মের সার্বিক আলোক-সংবেদিতা কম। তাই রঙিন ছবি তুলতে ভালো উজ্জ্বল আলোকের জন্য অপেক্ষা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ। তা ছাড়া এক্সপোজার টাইমের ব্যাপারে অর্থাৎ ক্যামেরার শাটার কতক্ষণ খোলা থাকবে সেই ব্যাপারে অধিকতর সতর্কতার প্রয়োজন হয়। মানুষের চোখ অনেক সময় হুবহু যা দেখে মস্তিষ্ক তাতে কিছু সংশোধন করে নেয়। অনেক দোষত্রুটি ঢেকে দেবার একটি নিজস্ব ক্ষমতা মস্তিষ্কের রয়েছে। রঙিন ফিল্মের কিন্তু এই ক্ষমতা নেই, এটা হুবহু যা আছে তা-ই এঁকে নেয়। তাই ছায়া-ঢাকা অংশ ছবিতে চোখে দেখার চেয়ে অধিকতর নীলচে আসে। খুব ভোরে অথবা সন্ধ্যায় তোলা ছবি অতিরিক্ত কমলা রঙের মনে হতে পারে। তা ছাড়া ছবির পরিবেশে যদি কোনো রঙের আধিক্য থাকে তা হলে ছবিতে তারও প্রভাব ঘটে। যেমন সবুজ গাছপালার পরিবেশে যদি কোনো মানুষের ফটো নেওয়া হয় তা হলে তার রঙেও খানিকটা সবুজ আভা আসে আশপাশ থেকে প্রতিফলিত সবুজের জন্য। চোখে দেখার সময় আমাদের মস্তিষ্ক সাধারণত অভ্যাসবশত এ-সবুজকে তুচ্ছ করে।

রঙিন ফাটোগ্রাফির প্রযুক্তি ক্রমেই আরো উন্নত হচ্ছে, এবং ভবিষ্যতে আমরা আরো বস্তুনিষ্ঠ ঝকঝকে ছবি পাওয়ার আশা করতে পারি।

# ছাপাখানায় সনাতন ও বৈপ্লবিক

মুদ্রণব্যবস্থা একটা প্রাচীন শিল্প। চীনদেশে উদ্ভাবিত হয়ে এটি হাজার বছর ধরে প্রচলিত রয়েছে। তা ছাড়া গুটেনবার্গ বারবার ব্যবহারযোগ্য অক্ষরবিন্যাসের পদ্ধতি উদ্ভাবন করে এ-শিল্পকে সত্যিকার ভিত্তি দিয়েছিলেন। সেও আজ প্রাচীন কাহিনী। অথচ সেই প্রাচীন কৌশল থেকে শুরু করে আজ ঝকঝকে অদ্ভুত জীবন্ত রঙিন যে-মুদ্রিত ছবি রোজ আমরা হাতে নিচ্ছি এর পেছনের কাহিনী কতখানি জানি? যদি খবর নিতাম তা হলে দেখতাম এই অতি প্রাচীন শিল্পটি কী সুন্দরভাবে বিবর্তিত হতে হতে আজ হঠাৎ করে কীরকম একটি বৈপ্লবিক ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

আগে দেখা যাক এরকম একটা বড় পরিবর্তনের আাগে বেশ কিছুদিন ধরে মুদ্রণের কৌশলগুলো কীরকম ছিল। হাজার বারোশো ছাপা হয়, বহুরঙা রঙিন ছবির বাহার তেমন প্রয়োজন নেই, এমন যেসব বই বা অন্যান্য মুদ্রিত বস্তু সেগুলো ছাপা লেটার প্রেস পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতির সাথেই আমরা সবাই মোটামুটি পরিচিত—কারণ রসিদবই ছাপাবার কাজে ব্যস্ত গলির ছোট্ট প্রেসটি থেকে শুরু করে অনেক নামকরা বড় প্রেসেও এই পদ্ধতি। ছাঁচে সিসা ঢেলে তৈরি করা হয় অক্ষর বা 'টাইপ'। কম্পোজিটর সাহেব বহুযত্নে এগুলো গেঁথে গেঁথে তেরি করেন। ধাতুর অক্ষরে গড়া লাইনো বা মনোটাইপ মেশিনে প্রত্যেকবার নূতনভাবে তৈরি ধাতুর টাইপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাজানো হয় টাইপরাইটারের মতো শুধু টাইপ করে গিয়ে। লেটার প্রেসে এই ধাতব পটের ছাপ কাগজে ফেলা হয় সিল মারার মতো করে। এটা অনেকটা ছোটরা আলুর পিঠে উলটো করে 'গাধা' শব্দটি ছুরি দিয়ে কেটে যেমন কাগজে-কাপড়ে ছাপ তোলে সেরকম ব্যাপার। কালির যে-ছাপটা পড়বে সেটুকু আলুর অন্য অংশ থেকে একটু জেগে থাকে উপরে।

লেটার প্রেসে মুদ্রণের অংশটুকু জেগে থাকে উপরে। ছবির জন্য প্রয়োজন হয় ব্লক। আলোক সংবেদনশীল আবরণে আবৃত ধাতুর পৃষ্ঠে স্বচ্ছ ফটোগ্রাফ থেকে ছবির ডিজাইনটার ইমেজ বা বিম্ব ফেলা হয়। এর ফলে রাসায়নিকভাবে এমন ঘটে যাতে যে-অংশে আলো পড়ে তা অ্যাসিডে ক্ষয়িত হবার উপযুক্ত হয়, অন্য অংশ অ্যাসিড থেকে নিরাপদে থাকে। এবার অ্যাসিডের মধ্যে ডুবিয়ে নাড়াচাড়া করলে মুদ্রিত হবার অংশ অর্থাৎ কালো বা গাঢ় অংশ ধাতুর পৃষ্ঠ থেকে জেগে থাকে, অন্যান্য অংশ অ্যাসিডে খেয়ে গিয়ে নিচে নেমে যায়। ছবির 'লাইন ব্লক' হিসাবে এগুলো ধাতুর অক্ষরের সাথে মুদ্রিতব্য পটের সাথে যুক্ত হয়।

লাইন ব্লকে ছাপনো যে-ছবি তাতে শুধু সাদা অংশ আর কালো অংশ এই দুই অংশই থাকতে পারে। সাদা আর কালোর মাঝামাঝি যে নানা গাঢ়ত্বের ধূসর অংশ একটি ছবিতে থাকতে পারে সেগুলো মুদ্রণে আনার কোনো উপায় এতে নেই। এগুলো হল ছবির 'টোন'। সাদা ও কালোর মাঝামাঝি এসব টোন আনার জন্য প্রয়োজন হত হাফ টোন ব্লক । ছাপাবার সময় কাগজে ছাপ পড়বে কালির একটাই রং যা সর্বত্র একই গাঢ়ত্বের : অথচ চোখে পড়তে হবে ছবির বিভিন্ন গাঢ়ত্বের নানা অংশ। যে-কৌশলে সেটি সম্ভব হয় তা হল 'স্ক্রিনের' ব্যবহার। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নিচে মুদ্রিত একটি হাফটোন ছবি বা ফটোগ্রাফ ধরলে দেখা যাবে এটা আগাগোড়া অনেকগুলো ক্ষুদ্র ডট বা বিন্দুতে গড়া। এদের কোনোটি বড়, কোনোটি ছোট। যেখানে বড় ডট বেশকিছু জড়ো হয়ে আছে সে-অংশ বেশি গাঢ় দেখায়, যেখানে

ডটগুলো ছোট সে-অংশ হালকা দেখায়। খালিচোখে ডটগুলো আলাদা করে চোখে পড়ে না ; বরং চোখে পড়ে তারা সম্মিলিতভাবে যে-টোনগুলোর সৃষ্টি করে তা। এভাবে আমরা আমাদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতাকে সুকৌশলে ব্যবহার করছি। কাগজে আসলে কালো আর সাদা এই দুই ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু দেখার সময় আমরা দেখছি নানা গাঢ়ত্বের বিভিন্ন ধূসর অংশও।

এই ডট তৈরি করা হয় ছবির স্বচ্ছ ফটোগ্রাফের ভেতর দিয়ে যাওয়া আলো একটি স্ক্রিন বা ঝাঁঝরির মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে। স্ক্রিনে লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি সূক্ষ্ম লাইন টেনে তাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোকর বা খোপের সৃষ্টি করা হয়। ফটোগ্রাফ থেকে যাওয়া আলো শুধু এই খোপগুলোর মধ্য দিয়ে গিয়ে ব্লকের উপর ডটের সৃষ্টি করে। আলো বেশি হলে ব্লকের কেমিক্যাল-মাখানো ধাতুর উপর আলোর ডটটি অধিক জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ব্লকের সাদা ডটটি বড় হয়। ওখানে কালো অর্থাৎ জেগে-থাকা ডটগুলো ছোট হয়। মুদ্রণের পর ছবির ঐ অংশ অপেক্ষাকৃত হালকা ধূসর দেখাবে। আলো যে-অংশে কম সেখানে খোপের মধ্য দিয়ে যাওয়া আলো ছড়াবে কম, আলোর ডট ছোট হবে, ব্লকেও কালো ডট বড় হবে বলে অংশটা বেশি কালচে ধূসর হবে।

টাইপই হোক, লাইন ব্লক হোক, আর হাফটোন ব্লকই হোক বা লেটার প্রেস মুদ্রণের মূল কথা হল এর মুদ্রণের অংশগুলো অন্য অংশ থেকে খানিকটা উপরে জেগে থাকে, এটা তাই উত্তল মুদ্রণ।

আজকের দিনে সবচেয়ে ব্যবহৃত উন্নত মানের যে মুদ্রণব্যবস্থা চালু রয়েছে সেটি কিন্তু উত্তল মুদ্রণ নয়, সেটি সমতল মুদ্রণ। লিথোগ্রাফি অথবা 'অফসেট' নামে পরিচিত এই মুদ্রণ-ব্যবস্থাই সর্বত্র প্রচলিত। প্রশ্ন উঠবে সমতল মুদ্রণ আদৌ কীভাবে সম্ভব? মুদ্রিত হবার জায়গা আর মুদ্রিত না হবার জায়গা এই উভয়কে একই সমতলে রেখে ছাপ নেওয়া হলে তা তো সব একাকার হয়ে যাওয়ার কথা।

ব্যাপারটি সম্ভব হয় বস্তুবিদ্যার একটি সনাতন নীতির কারণে। নীতিটা হল তেলে-জলে মিশ খায় না। লিথোগ্রাফি শব্দটার মানে হল পাথরের লেখন। অতীতে এতে একটি পালিশ-করা পাথরের উপর মুদ্রিতব্য বিষয়টি লিখে বা এঁকে নেওয়া হত তৈলাক্ত গ্রিজ দিয়ে। এভাবে তৈরি হয় ছাপার কাজ। এর উপর পানিতে ভেজা ব্রাশ বুলিয়ে নেয়া হলে পাথরের গা অন্য অংশে ভিজে গেলেও লেখা অংশটুকু ভিজবে না, কারণ তেলে-জলে যে মেশে না। এর পর তৈলাক্ত ছাপার কালি মাখালে ঘটবে ঠিক উলটোটা। শুকনো লেখা অংশে কালি লাগবে, অথচ ভেজা পরিষ্কার অংশে কোনো কালি লাগবে না। এবার পাথরে কাগজ চেপে ধরলেই মুদ্রণ সম্ভব হয়। এই পাথরের যুগ অবশ্য শেষ হয়েছে, তবে নামটা রয়ে গেছে।

আজ যাকে ফটো অফসেট পদ্ধতি বলা হয় তারও মূল নীতি এইই। এই আধুনিক লিথোগ্রাফিতে পাথরের বদলে ব্যবহৃত হয় বিশেষ সংবেদনশীল কেমিক্যাল্স-মাখানো ধাতব পাত, ছাপাখানার ভাষায় যাকে বলা হয় প্লেট। মুদ্রিতব্য জিনিসটি ফটোগ্রাফির মাধ্যমে এই প্লেটের উপর ফেলা হয়। এতে আলোকপ্রাপ্ত অংশটুকুর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। প্লেট তৈরি হয়ে গেলে সে-অংশগুলো খসখসে হয়ে থাকে বা পানি শোষণে ভিজে থাকার উপযুক্তভাবে, অন্য অংশগুলো থাকে তেলতেলে মসৃণ, সেখানে পানি ধরে না। নমনীয় এই প্লেটটাকে মুড়ে দেয়া হয় একটি সিলিন্ডারে। অন্য একটি সিলিন্ডারে মোড়ানো থাকে কাগজ। এই দুইয়ের মাঝখানে থাকে তৃতীয় আর একটি সিলিন্ডার-রাবার মোড়ানো। পানি আর কালি মাখাবার পর কালি লাগে শুধু তেলতেলে অংশে, ভেজা অংশে নয়। প্রথমে ছাপ ওঠে মাঝের এই রাবার সিলিন্ডারের উপর, তারপর সেই ছাপটি গিয়ে পড়ে কাগজের উপর। এভাবে পরোক্ষভাবে ছাপ নিলে মুদ্রণের মান উন্নত হয়, এজন্যই একে অফসেট বলা হয়।

একটি সমতল ধাতব পাত থেকে ছাপা হচ্ছে বলে অফসেটে টাইপ, ব্লক ইত্যাদির কোনো বালাই নেই। যা ছাপাতে চাই, ফটো তুলে নিয়ে তার ইমেজ প্লেটের উপর ফেললেই হল—অক্ষর, হাফটোন ছবি, রেখা সবকিছু। সেটা সরাসরি হাতে-লেখা হাতে-আঁকা, কমপিউটার টাইপ-করা সব জিনিসই হতে পারে।

মুদ্রণের তৃতীয় আর একটি পদ্ধতি চালু রয়েছে যা ব্যয়বহুল বলে আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু রঙিন হাফটোন ছবি ছাপাবার জন্য এটিই সবচেয়ে উন্নতমানের পদ্ধতি। গ্র্যাভ্যুর নামে পরিচিত এই পদ্ধতিটিকে বলা যায় অবতল পদ্ধতি : কারণ এতে মুদ্রণের অংশটি লেটার প্রেসের মতো জেগে থাকে না (উত্তল), লিথোগ্রাফির মতো সমতলেও থাকে না ; বরং থাকে ছোট ছোট গর্ত হয়ে খোদাই করা অবস্থায়। গর্তগুলোর গভীরতা সব জায়গায় সমান থাকে না, যদি ছবিতে টোন আনার প্রয়োজন হয়। যেখানে গাঢ় ছাপা সেখানে গর্ত বেশি গভীর। কালি মাখালে গর্তগুলো কালিতে ভর্তি হয়ে যায়। উপরে পৃষ্ঠের কালিটা মুছে ফেলা হয়। কাগজে ছাপ নিলে গর্তগুলোর কালিটুকু কাগজে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। গভীর গর্ত থেকে বেশি পুরু হয়ে কালি আসে বলে মুদ্রণের পর সে-অংশ অধিকতর গাঢ় দেখায়। গ্র্যাভ্যুরে অক্ষর, ছবি সবকিছুকেই কিন্তু স্ক্রিনের সাহায্যে ক্ষুদ্র ডটে ভেঙে ফেলতে হয়। তা নইলে অবিভক্ত একটানা কোনো অংশ খোদাই থাকলে সেই 'বড় গর্ত' থেকে কালি এসে আশেপাশে ছোপছাপ লেগে যাবে, ছাপার সূক্ষ্মতা বজায় থাকবে না। কাজেই গ্র্যাভ্যুর আসলে অসংখ্য গভীর ও অগভীর ডটের গর্ত দিয়ে ছাপানো জিনিস।

মুদ্রণের বড় বাহাদুরিটা হচ্ছে রঙিন ছবির ক্ষেত্রে। সব রকমের রং ও টোনের সমন্বয়ে গড়া যে-ছবি তাকে মুদ্রণে ধারণ করা কিছুতেই সম্ভব হত না যদিনা পদার্থবিদ্যার একটি সরল নিয়ম না থাকত। সেটি হল মাত্র তিনটি মৌলিক রঙের আলোর বিভিন্ন সমন্বয়ে সব রঙের আলো সৃষ্টি সম্ভব—এরা হল লাল, সবুজ আর নীল। মুদ্রণের ক্ষেত্রে রং বস্তুগুলো আলো শোষণ ও প্রতিফলন করে বলে এই তিনটির পরিপূরক রং হলুদ ম্যাজেনটা রঙিন ছবি সৃষ্টি সম্ভব। অবশ্য এর সাথে কালো রংটিও যোগ করলে ফল আরো ভালো হয়। সাধারণত মুদ্রিত রঙিন ছবিতে প্রাথমিক এই রংগুলো কিন্তু সত্যি সত্যি পরস্পর মিশে যায় না। ক্ষুদ্র আলাদা ডটের আকারে খুব কাছাকাছি পাশাপাশি থাকে মাত্র। ওদের সমন্বয়ে অন্য রঙ তৈরি হবার ব্যাপারটি ঘটে কাগজের উপর নয়; বরং আমাদের মস্তিষ্কের চেতনায়।

এখানেও আমাদের দৃষ্টির একটি সীমাবদ্ধতাকে আমরা সুকৌশলে কাজে লাগাচ্ছি।

এখন সনাতনভাবে রঙিন ছবি মুদ্রণের কাজ কেমন করে হয়ে আসছে তা বলা যাক। ব্যাপারটি শুরু হয় মূল ছবিটির ফটোগ্রাফ তোলা নিয়ে। পরপর তিনটি ফটো তোলা হয়, ক্যামেরায় লাল, সবুজ আর নীল ফিল্টার ব্যবহার করে। এর ফলে যে তিনটি নেগেটিভ পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটিতে এই তিনটি রং যথাক্রমে একটি করে অনুপস্থিত থাকে। একে বলা হয় রঙের সেপ্যারেশন বা পৃথীকীকরণ। এই তিনটি আলাদা নেগেটিভ থেকে যথারীতি স্ক্রিনের সাহায্যে তিনটি আলাদা হাফটোন ব্লক ( লেটার প্রেসের জন্য) অথবা প্লেট (লিথোগ্রাফির জন্য) তৈরি হয়। এদের মাধ্যমে হলুদ, ম্যাজেনটা ও নীল সবুজে একই স্থানে তিনটি ছবি পরপর ছাপালে তিন রঙের ডটগুলো সূক্ষ্মভাবে পরস্পরের কাছে অবস্থান করে বিভিন্ন রং ও টোনের ধারণা দেবে।

ভাল রঙিন ছবি মুদ্রণের জন্য যে প্রস্তুতিপর্ব সেটি মোটেই সহজ নয়। এর জন্য প্রথমত প্রয়োজন উপযুক্ত ক্যামেরা যাকে বলা হয় প্রসেস ক্যামেরা। এর ব্যবহার করে রং পৃথকীকরণের কাজ করতে কুশলীর যথেষ্ট দক্ষতা প্রয়োজন হয়। মূল ছবিতে রঙের যে বিস্তার (রেঞ্জ), প্রাধান্য (হাইলাইট), এবং সংঘাত (কনট্রাস্ট) এগুলো তাঁকে বুঝতে হয়। সেইমতো উপযুক্ত ডট সৃষ্টি করার জন্য যথাযথ স্ক্রিন বাছাই করতে তাঁকে ব্যবহৃত কাগজ, কালি এবং মুদ্রণের প্রেসের গুণাগুণের কথা স্মরণ রাখতে হয়।

মুদ্রণশিল্পে সর্বাধুনিক পরিবর্তনগুলো এতে রীতিমতো একটি বিপ্লব ঘটিয়েছে সাম্প্রতিককালে। এ-পরিবর্তনের মূলে কাজ করেছে কমপিউটারের ব্যবহার। সবচেয়ে বহুল-প্রচলিত যে-পরিবর্তন এসেছে তা হল ধাতুর টাইপের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। নির্দিষ্ট ছাঁচের অক্ষরের ডিজাইন এখন সঞ্চিত থাকে কমপিউটারের মেমোরিতে: ধাতুর অবয়বে কম্পেজিটারের খোপেও নয়, মনোটাইপের ছাঁচেও নয়। কম্পিউটার কী-বোর্ডে টাইপ করে গিয়ে মুদ্রিতব্য পৃষ্ঠাটি তার পর্দার উপর বিন্যস্ত করে নেওয়া হয়। ইচ্ছেমতো তাতে প্রুফ

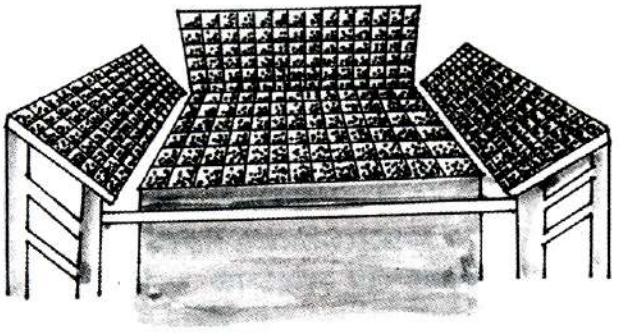

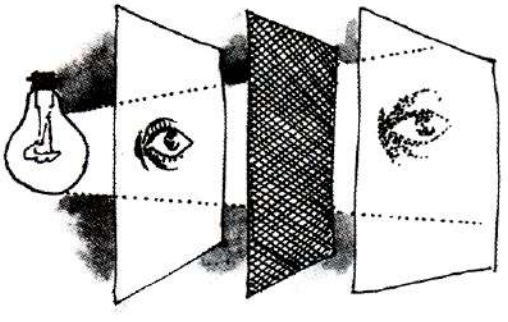

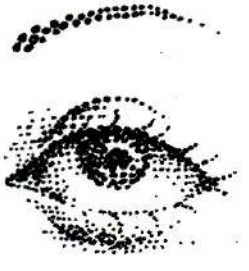

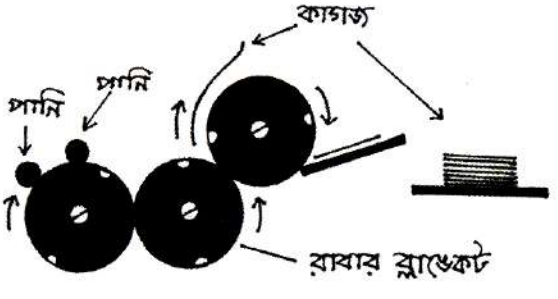
কাগজ
পানি
পানি
রাবার ব্লাঙ্কেট

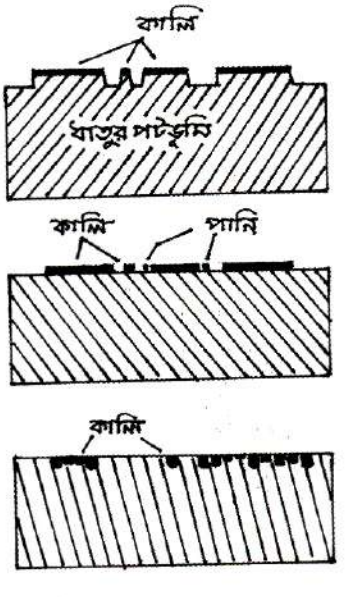
কালি
ধাতুর পাটাতন
কালি
পানি
কালি

সংশোধন, ভাঙা-চোরা, পুনর্বিন্যাস সবই করা সম্ভব কালির সংস্পর্শে আসার আগেই। পৃষ্ঠা চূড়ান্তভাবে তৈরি হলে তার একটি মুদ্রিত ছাপ কমপিউটার থেকেই পাওয়া যায় তার একটি মুদ্রিত ছাপ লিথোগ্রাফি প্লেট তৈরিতে সরাসরি ব্যবহারের জন্য। কোথাও এখন গলিত ধাতুর বিন্দুমাত্র প্রয়োজন হচ্ছে না।

আর বড় পরিবর্তন এসেছে রঙিন মুদ্রণের ক্ষেত্রে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত রঙিন মুদ্রণের জন্য রং পৃথকীকরণ করে প্লেট তৈরি করা এত সময় ও পরিশ্রমসাপেক্ষ ছিল যে, তাতে মুদ্রণব্যয় পড়ে যেত অনেক। সময়ের কারণে দৈনিক পত্রিকায় রঙিন ছবি ছাপানো অসুবিধাজনক ছিল। যেসব চকমকে ম্যাগাজিনের, বইয়ের বা ক্যালন্ডারের অনেক বেশি কাটতি তারাই শুধু নিশ্চিন্তে ধীরেসুস্থে ভালো রঙিন ছবির উদ্যোগ নিতে পারত। কিন্তু এখন আধুনিক প্রযুক্তি সব বদলে দিয়েছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুতিপর্ব শেষ করা এখন সম্ভব যেখানে আগে দিনের পর দিন লেগে যেত। দৈনিক পত্রিকার জন্য বিশেষ ম্যাগাজিনের কয়েক হাজার মাত্র কপি ছাপাবার জন্যও এখন রঙিন ছবি অহরহ ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশাল প্রসেস ক্যামেরাগুলোর বদলে এসেছে ছিমছাম কমপিউটারনির্ভর ইলেকট্রনিক সামগ্রী।

কৌশলটি হল মূল ছবির সমস্ত তথ্যকে কমপিউটারে সংখ্যার (ডিজিটাল) আকারে রূপান্তরিত করে সঞ্চিত করা। আলোকসন্ধানী যন্ত্র স্ক্যানার মূল ছবির প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশের লাল, সবুজ ও নীল অংশ নিখুঁতভাবে মেপে নিয়ে কমপিউটারের মেমোরিতে জমা রাখে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে কমপিউটার পৃথকীকৃত রঙের তিনটি আলাদা নেগেটিভ তৈরি করে দেয়। এগুলো কমপিউটারের পর্দায় দেখাও যেতে পারে। ওখানেই কুশলী প্রয়োজনমতো রদবদলের নির্দেশ কমপিউটারকে দিতে পারেন। ছাপার কালি, কাগজ ইত্যাদির কথা খেয়াল রেখে তাঁকে এটা করতে হয়। এভাবে প্রেসে সত্যি সত্যি ছাপ না নিয়েই পর্দায় ফলাফলগুলো আগাম দেখা সম্ভব হয় বলে অনেক ঝামেলা বেঁচে যায়। পৃথকীকৃত নেগেটিভের জন্য প্রথম দিকে সূক্ষ্ম সাধারণ স্ক্রিন ব্যবহার করা হত। এখন ডটগুলোও ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কম্পিউটারে সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলে ডটের আকার ও আকৃতি ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করা যাচ্ছে। মেমোরিতে রাখা একই তথ্য থেকে বিভিন্ন প্রিন্ট তৈরির সময় বিভিন্ন ধাঁচের ডট ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে। মূল ছবির সংখ্যায়িত তথ্যগুলো কমপিউটারের ডিস্কে সঞ্চিত করে পরবর্তী ব্যবহারের জন্য রেখে দেওয়া যায়, স্থানান্তর করা যায়। সংখ্যায়িত তথ্যগুলো টেলিফোনের সাহায্যে মুহূর্তে পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে স্থানান্তরিত করে তাৎক্ষণিক মুদ্রণের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

কমপিউটারের সুযোগ নিয়ে রঙিন মুদ্রণে আরো নানা কৌশল প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে। ধরা যাক, একটা ছবির কিনারা অনুসরণ করে কমপিউটারের সাহায্যে ছবিতে একটি জানালা কাটার মতো ইমেজ (মাস্ক) তৈরি করা হল। এবার কমপিউটারের সাহায্যে মাস্কের কিনারার প্রতিটি ডটের চারিদিকে একটি সাদা ঝালর লাগাবার ব্যবস্থা করা হল। এতে পটভূমির সাথে সংঘাত (কনট্রাস্ট) বাড়িয়ে ছবির স্পষ্টতা অনেকখানি বৃদ্ধি করা যায়।

কৌশলপ্রয়োগের আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। মনে করা যাক, ঘরের জানালার কাচে সমুদ্রের দৃশ্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছে— ছবিতে এমন একটি বিষয় কৃত্রিমভাবে জুড়ে দিতে হবে। প্রথমে জানালার জন্য ইলেকট্রনিক একটি মাস্ক তৈরি করা নেয়া হল। এই মাস্কটিকে সমুদ্রদৃশ্যের উপর স্থাপন করে মাস্কের বাইরের অংশ এখান থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো। এর পর জানালা ও খণ্ডিত সমুদ্রের ইমেজকে ইলেকট্রনিক ভাবে মিলিয়ে নেওয়া হল। ফাটোগ্রাফির কোনো মেশিনের সহায়তা ব্যতীত সম্পূর্ণ দুটি আলাদা ছবি থেকে কমপিউটারের মধ্যেই এ-কাজটি সেরে ফেলা এভাবে সম্ভব হলো।

সবাই এ-ব্যাপারে একমত যে রঙিন মুদ্রণের আদর্শ পদ্ধতি হল গ্র্যাভ্যুর। এতে রঙের কাজটা খুব চমৎকার আসে। তা ছাড়া এর প্রেসটি সরল ও মজবুত ; আর খোদাই-করা যে-সিলিন্ডার থেকে এটা ছাপানো হয় সেটা কার্যত অবিনাশী, অসংখ্য কপি এর থেকে ছাপানো সম্ভব মানের কোনো অবনতি না

ঘটিয়ে। গ্র্যাভ্যুরে ভালো মুদ্রণ পেতে ভালো কাগজ ব্যবহার করতে হবে এমনও কোনো কথা নেই; অথচ অফসেট লিথোগ্রাফিতে ভালো কাগজ একটি পূর্বশর্ত।

গ্র্যাভ্যুরের সমস্যা হল এর মুদ্রণের প্রস্তুতিপর্বটি সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। একটি দামি তামার তৈরি সিলিন্ডারের গা খোদাই করে এর মুদ্রণপট তৈরি হয়। তারপর স্থায়িত্বের জন্য একে ক্রোমিয়ামের আবরণে আবৃত করতে হয়। দ্রুত ও সস্তা ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে মুদ্রণপট খোদাই করার কাজটি করা যায় কি না এখন তা নিয়ে চেষ্টা চলছে। একটি পদ্ধতিতে কমপিউটারের ডিস্ক মেমোরিতে রাখা সংখ্যায়িত তথ্যগুলোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি খোদাই করার যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেকটি প্রাথমিক রঙের জন্য মূল ছবির এক এক ক্ষুদ্র অংশে পরিমাপিত রঙের তীব্রতা অনুসারে এই যন্ত্র কাজ করে যায় এবং সঠিক জায়গায় সঠিক গভীরতার ডট গর্ত করে করে পুরো সিলিন্ডারের উপর পরিভ্রমণ করতে থাকে। এভাবে নিয়ন্ত্রিত লেজার রশ্মি ব্যবহার করেও আর একটি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

দৈনিক পত্রিকার রঙিন ছবি ছাপাবার কিছু নিজস্ব সমস্যা রয়েছে। পত্রিকা সাধারণত মুদ্রিত হয় সস্তা নিউজপ্রিন্টের উপর লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে। রঙিন ছবির জন্য লিথোগ্রাফিতে আরো ভালো কাগজ প্রয়োজন। সস্তা কাগজের উপর ছাপাবার উপযুক্ত কৌশল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ইতালিতে এর জন্য ফ্লেক্সোগ্রাফি নামে একটা পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। আলোকসংবেদী প্লাস্টিক প্লেটে উত্তল মুদ্রণপটের সৃষ্টি করে এটা করা হয়। মুদ্রণপট তৈরিতে ইলেকট্রনিক প্রস্তুতির সুবিধাও গ্রহণ করা যায়। ফ্লেক্সোগ্রাফি যে-কোনো মানের কাগজের উপর ভালো তো আসেই, এমনকি ধাতুর পাত, প্লাস্টিকের শিট, কার্ডবোর্ড সবকিছুর উপরেই এর ভালো ফল পাওয়া যায়। প্যাকেজিং শিল্পে এর ভবিষ্যৎ চমৎকার। এর মুদ্রণপটে পরিবর্তন ঘটাতে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু কেটে বাদ দিয়ে সেখানে নূতন অংশ সেঁটে দিলেই হল।

হাফটোন ও রঙিন মুদ্রণের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তনের আর একটি প্রচেষ্টা চলছে আরো মৌলিক একটি দিক থেকে। স্ক্রিন ব্যবহার করে ছবিকে ডটে ভেঙে ফেলার একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বাস্তব কারণে স্ক্রিন কত সূক্ষ্ম হতে পারে তার একটি সীমা রয়েছে। ফাটোগ্রাফের মধ্যে এমন কোনো দ্রষ্টব্য যদি থাকে যার আকার স্ক্রিনের দুই খোপের মধ্যকার দূরত্বের চেয়ে ছোট তা হলে দুই ডটের মধ্যে তার অস্তিত্ব মুদ্রণে ধরা পড়বে না। তাই এখন চেষ্টা চলছে স্ক্রিন ছাড়াই হাফটোন সৃষ্টি করার। ফটোগ্রাফিক ফিল্মের রাসায়নকে পরিবর্তিত করে এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। ফটোগ্রাফকে প্রস্ফুটিত (ডেভেলপ) করার সময় এর সূক্ষ্ম কণা ধীরে জমাট বাঁধে। ফলে আলোতে উদ্ভাসিত করার পর ফিল্মে হালকা অংশগুলোতে কণা জমাট বাঁধা তালগোল পাকানো ফোঁটা গাঢ় অংশের চেয়ে ছোট হবে। এভাবে স্ক্রিনের মতো এখানেও একধরনের ডটের সৃষ্টি হয় ; তবে সেই ডটের পারস্পরিক দূরত্ব ক্ষুদ্রতর ও পরিবর্তনশীল হতে পারে। তা ছাড়া স্ক্রিনের খোপের হিসাবে না হয়ে এদের অবস্থান ফিল্মের যত্রতত্র হতে পারে। ব্যবহারযোগ্য অধিকাংশ স্ক্রিনে যেখানে সেন্টিমিটারে ৬০টির বেশি ডট পাওয়া যায় না এখানে সেন্টিমিটারে ২৫০টি পর্যন্ত ডট থাকতে পারে। এর মানে স্ক্রিনের সাহায্যে নূতন ডটের সৃষ্টি না করে ফটোগ্রাফের এই স্বাভাবিক ডটগুলোতে যদি সরাসরি মুদ্রণপট তৈরিতে ব্যবহার করা যায় তা হলে ছবির সূক্ষ্মতর সব দ্রষ্টব্য-বস্তুগুলো মুদ্রণেও ধারণ করা সম্ভব হবে।

নূতন উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে ফিল্মের রসায়নকে এমনভাবে পরিবর্তিত করা হচ্ছে যাতে প্রস্ফুটিত করার সময় সিলভারকণার জমাট বাঁধার কাজটি অতি ধীরে এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবে করা সম্ভব হয় যার থেকে স্ক্রিনের সহায়তা ছাড়াই সরাসরি হাফটোন প্লেট করা যায়। এরকম প্লেট থেকে যে-রঙিন ছবি তাতে মূল মুদ্রিতব্য বস্তুর সূক্ষ্মতাগুলো অনেক বেশি আনা সম্ভব হচ্ছে।

গুটেনবার্গের পুনর্বিন্যাসযোগ্য টাইপ আবিষ্কারের পর থেকে মুদ্রণের ক্ষেত্রে অনেক অনেক অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু আজ যা হচ্ছে তাকে সত্যি বৈপ্লবিক বলা যায়। আর এই বিপ্লবের মূলে কোনো একটা কিছুর অবদানকে যদি বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে হয় তবে তা হবে কমপিউটার।

# মাইক্রোওয়েভ

মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ গোলযোগের জন্য এতটা থেকে এতটা পর্যন্ত অমুক উপকেন্দ্র থেকে আমাদের অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় আমরা দুঃখিত—টেলিভিশন-ঘোষকের এমনি ঘোষণা থেকেই হয়তো আমরা জানতে পারি যে, মাইক্রোওয়েভ আমাদের দেশব্যাপী টেলিভিশন সম্প্রচারে একটি ভূমিকা পালন করছে। আসলে আমাদের যোগাযোগ-ব্যবস্থায় মাইক্রোওয়েভের স্থান এর চেয়ে আরো অধিক ব্যাপ্ত। বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে নানা জায়গায় এবং ঢাকা শহরেরও ভেতরে প্রায়ই আমাদের নজরে পড়ে উঁচু টাওয়ারের উপর জামবাটির মতো কতগুলো জিনিস। এরা মাইক্রোওয়েভ অ্যানটেনা—দেশের টেলিফোন যোগাযোগব্যবস্থার একটি প্রধান সহায়।

মাইক্রোয়েভ হল খুব হ্রস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রেডিওতরঙ্গ। লংওয়েভ, মিডিয়াম ওয়েভ, শর্টওয়েভ হয়ে তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমতে কমতে টেলিভিশনে ব্যবহৃত আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে এসে এক মিটারেরও কম দৈর্ঘ্যে এসে যায়। আরো কম তরঙ্গদৈর্ঘ্য হল মাইক্রোওয়েভের—৩০ সেন্টিমিটার থেকে ১ মিলিমিটার পর্যন্ত। তরঙ্গদৈর্ঘ্য এর চেয়ে কমলে সেটা ইনফ্রারেড অদৃশ্য আলোর পর্যায়ে এসে পড়ে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে মাইক্রোয়েভ ব্যবহারে বেশ কয়েকটা সুবিধা রয়েছে। এতে বিদ্যুৎ চৌম্বক সিগন্যালের আকারে তথ্য অপেক্ষাকৃত অধিক-সংখ্যায় প্রেরণ করা সম্ভব। এর চেয়ে অধিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রেডিওতরঙ্গের চেয়ে এটা আরো বেশিসংখ্যক টেলিফোন কথোপকথন, বেশি টেলিভিশন চ্যানেল একই সঙ্গে ধারণ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত আলোকতরঙ্গের কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বলে এর আচরণও হয়ে পড়ে অনেকটা আলোর মতো। আলোর মতোই কঠিন বস্তু থেকে এটা প্রতিফলিত এবং বিক্ষিপ্ত হতে পারে। এভাবে আলোর মতোই এটা বস্তুটির একটি 'ছবি' সৃষ্টি করতে পারে, যদিও সে-ছবি এ-পর্যায়ে অদৃশ্য থাকবে। প্রতিফলিত হয়ে দূরবর্তী বস্তুর একধরনের ছবি সৃষ্টি করতে পারে বলে মাইক্রোওয়েভকে রেডারযন্ত্রে ব্যবহার করা হয়। রেডারের কাজই হলো দূরবর্তী বস্তুর অবস্থান এবং দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা দেওয়া—বিমান, জাহাজ, মেঘ ইত্যাদির।

মাইক্রোওয়েভের তৃতীয় সুবিধা হল একে খুব সহজে অ্যানটেনা থেকে বিকীর্ণ করা চলে। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তরঙ্গের চেয়ে মাইক্রোওয়েভে পাওয়ারের অধিকতর অংশ অ্যানটেনা থেকে বিকীর্ণ হতে পারে, ফলে অপচয় কম হয়। আসলে মাইক্রোওয়েভকে তারে বা বর্তনিতে ধারণ করাটাই বরং বেশি কঠিন। আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় দূরবর্তী স্থানের সাথে টেলিফোন যোগাযোগে আজকাল মাইক্রোওয়েভ ব্যবহৃত হচ্ছে। তা ছাড়া টেলিভিশন সিগন্যাল এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে নেওয়া বা ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র বা মাঠ পর্যায়ের ক্যামেরা থেকে সম্প্রচার কেন্দ্রে নেওয়ার জন্যও মাইক্রোওয়েভের ব্যবহার সর্বত্র ব্যাপক। আর এই ব্যবহারে এসে পড়ে সেই জামবাটির মতো দেখতে অ্যানটেনা। আসল অ্যানটেনাটি থাকে বাটির সামনে ; এখান থেকে বিকীর্ণ হয়ে ঐ বাটি আকৃতির প্রতিফলকে প্রতিফলিত মাইক্রোওয়েভ বেশ সরু এবং সুনির্দিষ্ট একটি বিমের আকারে একেবারে সরলরেখায় বহুদূর চলে যায়। এভাবে যেখানে আমরা সিগন্যালকে পৌঁছাতে চাই সেখানে অনুরূপ আর একটি অ্যানটেনার হুবহু অভিমুখে যায় বলে অন্যান্য দিকে এর পাওয়ারের কোনো বাজে খরচ নেই।

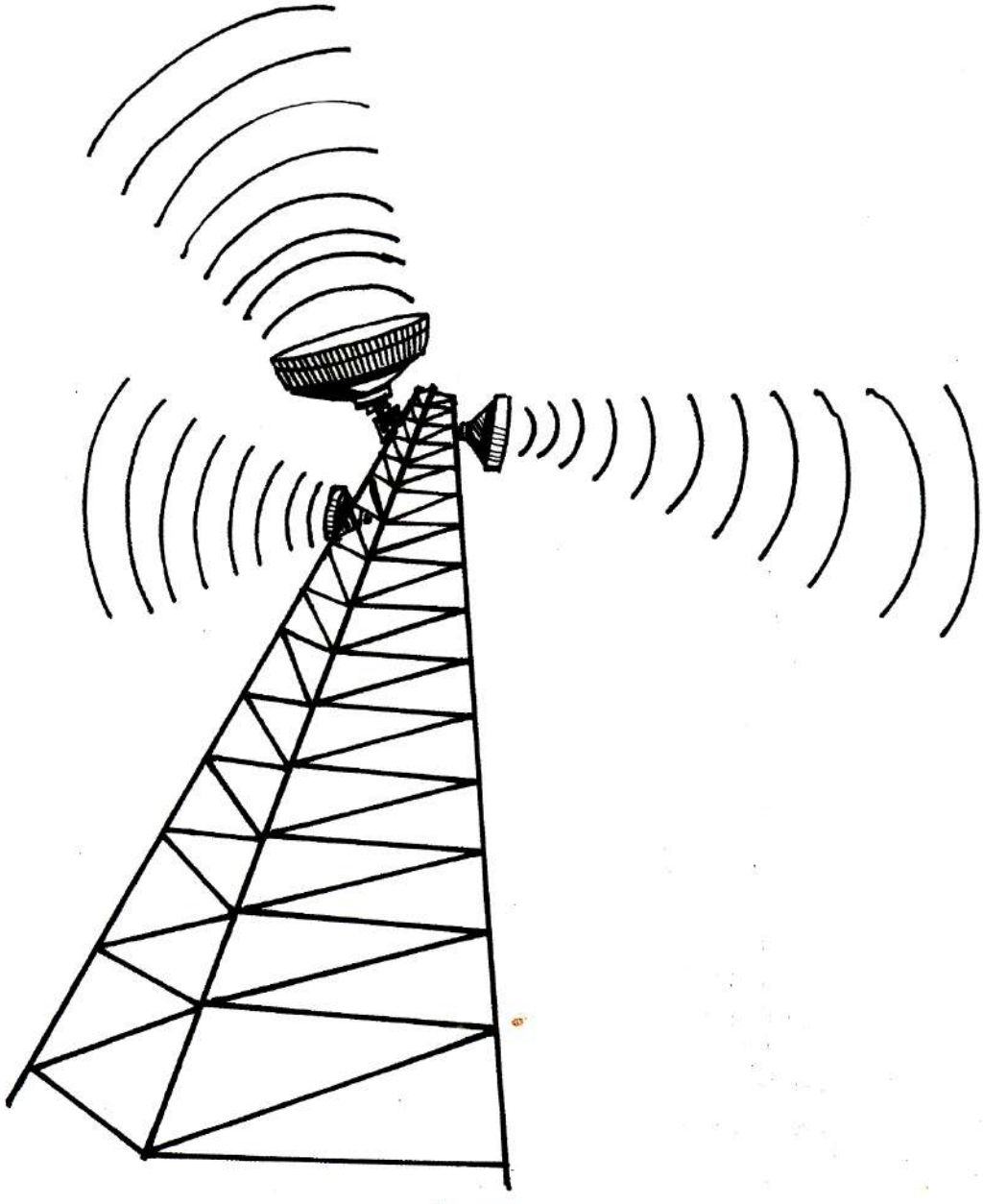

মাইক্রোওয়েভ

পাওয়ারভেদে ২০ থেকে ৪০ মাইল দূরত্বে সিগন্যালকে নিয়ে যেতে পারে বিকীর্ণ মাইক্রোওয়েভ বিম। এর বেশি দূরত্বে নিতে হলে অবশ্য মাঝখানে বিবর্ধকের ব্যবস্থা করতে হয় সিগন্যালকে পুনরায় জোরদার করে নেওয়ার জন্য। এটা করা হয় রিপিটার স্পেটশনের মাধ্যমে প্রেরণ অ্যানটেনার সাথে হুবহু দৃষ্টিরেখায় স্থাপিত অ্যানটেনায় গৃহীত ও বিবর্ধিত হয়ে সিগন্যালকে পিঠাপিঠি আর একটি অ্যানটেনার সাহায্যে আবার সামনের দিকে বিমের আকারে বিকীর্ণ করা হয়। এজন্যই আমরা দেশের নানা জায়গায় এই অ্যানটেনাগুলো দেখে থাকি। স্পষ্টত এক্ষেত্রে একটি অ্যানটেনা থেকে তাকালে পরবর্তী রিপিটার অ্যানটেনাকে দিগন্ত-রেখার উপরে থাকতে হবে।

মাইক্রোওয়েভ স্পন্দন তৈরি হয় বিশেষ ধরনের ওসিলেটর বা স্পন্দকের সাহায্যে। ক্লাইস্ট্রন ও ম্যাগনেট্রন এই নামে পরিচিত দুটি বিশেষ ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র এই স্পন্দক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। অ্যানটেনার সাহায্যে বিকীর্ণ করার আগে বা অ্যানটেনা দ্বারা গৃহীত হবার পর মাইক্রোওয়েভকে প্রবাহিত করবার জন্য তার বা কেব্‌ল ব্যবহৃত হয় না ; ব্যবহৃত হয় একধরনের আয়তাকৃতি ফাঁপা ধাতব নল যাকে বলা হয় ওয়েভ গাইড। এর কারণ সাধারণ কেবলে এত হ্রস্ব তরঙ্গ নিয়ে যেতে অপচয় হবে অনেক বেশি। তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি ১০ সেন্টিমিটারও হয় কেবলের মাধ্যমে মাত্র ৫ মিটার যেতেই অর্ধেক পাওয়ার নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ওয়েভ গাউডের মধ্য দিয়ে একই পথ যেতে এর সামান্যতম পাওয়ারও নষ্ট হয় না। ওয়েভ গাইডের মধ্যে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ সীমাবদ্ধ থাকে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যায় ; কোনোরকম বিকৃত না হয়ে বাঁকও ঘুরতে পারে। বিকীর্ণ হবার জন্য অ্যানটেনাটি হল ওয়েভ গাইডের প্রান্তে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অর্ধেক পরিমাণ দীর্ঘ একটু খালি স্লট বা চেরা জায়গা। এখান থেকে বেরিয়ে বাটি আকৃতির প্রতিফলকে প্রতিফলিত হয়ে এটা বিকীর্ণ হয় সোজা বিমের আকারে খোলা জায়গার মধ্য দিয়ে।

যোগাযোগব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি চমকপ্রদ ব্যবহার রয়েছে মাইক্রোওয়েভের। আমাদের দেশে এখনো তেমন ব্যাপক প্রচলন না থাকলেও উন্নত দেশগুলোতে বহু বাড়িতে এখন রান্নাবান্না চলে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে। মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ খাদ্যদ্রব্যের ভেতরে প্রবেশ করলে তার অণুগুলোকে উত্তেজিত ও কম্পনশীল করে তোলে। এর ফলে অণুতে অণুতে যে ঘর্ষণের সৃষ্টি হয় তাতেই খাদ্যদ্রব্য উত্তপ্ত হয়ে পড়ে এবং রান্নার কাজ সম্পন্ন হয়।

মজার ব্যাপার হল, খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে এমনটি হলেও মাইক্রোওয়েভ কিছু কাচ, কাগজ, চীনামাটি ইত্যাদির ভেতর দিয়ে ঢুকে বের হয়ে যায় তাকে কোনোভাবে উত্তপ্ত না করেই। কাজেই এসব পাত্রে বা এসবে ঢেকে খাদ্যকে এই ওভেনে রাখা হলে খাদ্য রান্না হয়ে যাবে কিন্তু পাত্র গরম হবে না। ফলে নির্ভয়ে এদের ব্যবহার করা চলে। তা ছাড়া ধাতব কিছু এর ভেতরে রাখলে মাইক্রোয়েভ প্রতিফলিত হয়ে চলে যায় বলে তাও গরম হয় না। মাইক্রোওয়েভ ওভেনের আরো বড় সুবিধা হল এতে রান্নার সময় অনেক কম লাগে। অবশ্য সময়টা নির্ভর করে কতখানি খাদ্য ওভেনে দেওয়া হয়েছে তার উপর। মাইক্রোওয়েভ ওভেনের মধ্যে থাকে মাইক্রোওয়েভ সৃষ্টির জন্য একটি ম্যাগনেট্রন। একটি আয়তাকৃতির ধাতব নলের মধ্য দিয়ে মাইক্রোওয়েভ গিয়ে পড়ে একটি ঘুরন্ত পাখার ধাতব ব্লেডগুলোর উপর। এরা মাইক্রোওয়েভকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে ওভেনের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় এবং ওয়েভের ধাতব দেয়ালে এটা বারবার প্রতিফলিত হতে থাকে যতক্ষণ খাদ্যদ্রব্য দ্বারা শোষিত না হচ্ছে।

ক্ষুদ্রকায় রেডিওতরঙ্গ মাইক্রোওয়েভ রাডারের অনুসন্ধানকাজে, টেলিফোন-কথোপকথনে, টেলিভিশনের ছবি পাঠাতে এমনকি রান্নাঘরে নিজে অনুত্তপ্ত থেকে রান্না করতে যে-সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে সেটা খুবই গুরুত্বপুর্ণ।

# অপটিক্যাল ফাইবার

সাম্প্রতিকালে টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন এসেছে যার মূলে রয়েছে অপটিক্যাল ফাইবার। অপটিক্যাল ফাইবার মানে আলোকসংবাহী তন্ত্র। টেলিযোগাযোগে সাধারণত সিগন্যাল একস্থান থেকে অন্য স্থানে যায় বিদ্যুৎপ্রবাহ অথবা মাইক্রোওয়েভ বা রেডিওওয়েভের রূপে। কিন্তু অপটিক্যাল ফাইবার প্রযুক্তিতে এটি যায় আলোরূপে।

আলোর মাধ্যমে সংবাদপ্রেরণের ইতিহাস বেশ প্রচীন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রিসে পলিবাস নামক লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন কীভাবে গ্রীক বর্ণমালার সব বর্ণকে আগুনের আলোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কোডবদ্ধ করা হয়েছিল এবং তার ভাষায় দূরে সংবাদ পাঠানো হয়েছিল। আধুনিকতর কালে টেলিফোনের আবিষ্কর্তা গ্রাহাম বেল শব্দের কাঁপুনিকে আলোর কাঁপুনিতে পরিণত করে দূরে নিয়ে তাকে আবার বৈদ্যুতিক উপায়ে শব্দে পরিণত করার পদ্ধতিও উদ্ভাবন করেছিলেন। এটি ১৮৮০ সালের কথা। এ-জাতীয় পদ্ধতি সীমিত আকারে ব্যবহৃত হলেও তা জনপ্রিয়তা পায়নি।

ষাটের দশকে লেজারের আবিষ্কারের পর টেলিযোগাযোগের মাধ্যম হিসাব আলো ব্যবহারের একটি নবদিগন্তের সূত্রপাত হয়। খুব সুনির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির যে সমসত্ব আলো লেজাররূপে পাওয়া গেল তাকে সরু কাচতন্তুর মধ্য দিয়ে দূরে সংবাদিত করার বেশকিছু সুবিধা রয়েছে। বৈদ্যুতিক তার বা ধাতব ওয়েভ গাইডের তুলনায় এই মাধ্যম অনেক ছিমছাম, সহজ ও সস্তা। আলোও একটি বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ, কিন্তু এ-তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি সাধারণত রেডিও টেলিযোগাযোগে ব্যবহৃত তরঙ্গের তুলনায় অনেক বেশি। এমনকি টেলিভিশন সম্প্রচারে যে আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহৃত হয়, আলোর ফ্রিকোয়েন্সি তার চেয়েও এক লক্ষ গুণ বেশি। এটি এর তথ্য বহনক্ষমতা অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়।

মাইক্রোওয়েভ বা অনুরূপ রেডিওওয়েভ গাইডের যে-আকার তার তুলনায় আলোক-ওয়েভ গাইডের আকার অনেক ছোট হতে পারে কারণ এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট। ফলে চুলের মতো সরু একটি কাচতন্তু কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলের সম-পরিমাণ প্রশস্ত ব্যান্ডে তথ্য ধারণ করে নিয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া তামার কেব্‌ল তারে পথিমধ্যের যে-শক্তি অপচয় ঘটে সে-তুলনায় কাচতন্তুর মধ্য দিয়ে আলোর পরিচয় নিতান্ত কম। ফলে মধ্যবর্তী বিবর্ধন ছাড়া কেব্‌লের তুলনায় অপটিক্যাল ফাইবার তথ্য নিয়ে যেতে পারে অন্তত ১০০ গুণ বেশি দূরত্বে।

কাচের সাধারণত যে প্রতিসরাঙ্ক তাতে কাচের তন্তু তৈরি করা হলে অপটিক্যাল ফাইবারকে অতি বেশি সরু হওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই এটি তৈরি হয় একটি অন্তস্থ তন্তু বা কোর এবং তার বাইরে একটি আচ্ছাদন বা ক্লাডিং-এর আকারে। কোরের প্রতিসরাঙ্ক ক্ল্যাডিং-এর প্রতিসরাঙ্কের চেয়ে সামান্য বেশি রাখা হলে তন্তুকে বাস্তবে ব্যবহারযোগ্য আকারে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। কোর এবং ক্ল্যাডিং-এর সংযোগ যেখানে সেখান থেকে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন একে সব সময় কোরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সামনে এগিয়ে নেয়, কখনো দেয়াল দিয়ে বাইরে আসতে দেয় না। তন্তুকে যদি বাঁকানো হয় এই পূর্ণ

অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন আলোকে ঠিকই তন্তুর লম্বালম্বিতেই এর মধ্য দিয়ে পরিবাহিত করে। কাজেই তন্তুর বাঁক নেয়া বা প্যাঁচ খাওয়া এর কাজে কোনো ব্যাঘাত ঘটায় না।

আলোক তন্তু প্রযুক্তিতে আলোর উৎস হিসাবে সাধারণত সেমিকন্ডাক্টর লেজার ব্যবহার করা হয়। এভাবে লেজার ব্যবহারের মাধ্যমে ছোট আকারে সরল গঠনে দক্ষ লেজার উৎস পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া সেমিকন্ডাক্টরভিত্তিক আর একটি আলোক উৎস তন্তু প্রযুক্তিতে গুরুত্ব লাভ করেছে। এটি হচ্ছে লাইট এমিটিং ডায়োড যা এল ই ডি নামেই অধিক পরিচিত। এল ই ডি-তে আলোর উৎপাদন হয় লেজার ডায়োডের মতোই। কিন্তু এক্ষেত্রে আলো লেজারের মতো সমসত্ত্ব হয় না। তাই আলোক তন্তু যোগাযোগে এদের ব্যবহার করতে হলে এল ই ডি-কে খুব ক্ষুদ্র এলাকা জুড়ে উচ্চ উজ্জ্বলতার আলোর নিঃসরণ করতে হয়।

উপযুক্ত আলোক উৎসের উপর প্রেরিতব্য সিগন্যাল আরোপ করে যে-আলোক অপরিক্যাল ফাইবারের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয় গন্তব্যে, সেখানে পৌঁছার পর তার থেকে সিগন্যাল উদ্‌ঘাটনের পালা। এজন্য প্রয়োজন এমন ফটোডিটেক্টর যার ফ্রিকোয়েন্সির প্রশস্ততা এবং সংবেদনশীলতা যথেষ্ট বেশি। সেমিকন্ডাক্টর ফটোডায়োড একদিকে যেমন এই দুটি শর্ত পূরণ করে, অন্য দিকে তাকে ছোট আয়তনে এবং সবল গড়নে তৈরি করা সম্ভব। ফটোডায়োডের কাজ হল আলোর সিগন্যালকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে পরিণত করা। এখান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে মূল তথ্যকে উদ্ধার করা হয়।

মাঝখানে তথ্যকে বৈদ্যুতিকভাবে প্রেরণ না করে আলোকরূপে প্রেরণ করার সুবিধা অনেক। এতে সিগন্যালে অনেক বেশি তথ্যের যোগাযোগ সম্ভব, যার ফলে একই তন্তু দিয়ে অনেক বেশি তথ্যের সঞ্চালন সম্ভব। অপচয় কম বলে পাথেয় শক্তিক্ষয় অনেক কম, বিবর্ধনের জন্য মাঝপথের রিপিটার কম লাগছে। বৈদ্যুতিক কেবলে যা হয় ইনডাকটিভ অর্থাৎ একের আবেশজনিত প্রভাব পড়ে অন্যের ব্যাঘাত এক্ষেত্রে ঘটে না। ফলে এক তারের প্রভাব অন্য তারে পড়ে যে ক্রসটক কেবলের তারগুচ্ছ সৃষ্টি হয় অপটিক্যাল ফাইবারের ক্ষেত্রে তা হতে পারে না।

অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে ডিজিটাল ও এনালগ এই উভয় প্রকারের যোগাযোগ সম্ভব। তবে এর পূর্ণ সুযোগ ডিজিটালেই নেয়া সম্ভব। যে-ধরনের টেলিফোন যোগাযোগ এখনো আমাদের দেশে অধিক প্রচলিত তাতে তথ্য উদ্ঘাটনের সময় অবাঞ্ছিত নয়েজ বেশি থাকলে বিশ্বস্ত সিগন্যাল পাওয়া মুশকিল হয়। অপটিক্যাল ফাইবার টেলিফোন এনালগ হলে বেশি নয়েজ এতে তৈরি হতে দেয়া যায় না। খুব অধিক ফ্রিকোয়েন্সিও ব্যবহার করা যায় না। ফলে এনালগ যোগাযোগ ফাইবার অপটিক্স ব্যবহার করে নিম্ন ব্যান্ড এবং স্বল্প দূরত্বে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। কিন্তু ডিজিটালে এই সীমাবদ্ধতা নেই। তথ্যকে তা কথাবার্তা, ছবি যা-ই হোক-না কেন তাকে ডিজিট্যাল ফিন্যান্সে রূপান্তরিত করার পর তার রূপ আলোর উপর আরোপ করলে টেলিযোগাযোগ অপটিক্যাল ফাইবার সকল সুবিধা পূর্ণভাবে পাওয়া যায়।

উন্নত দেশসমূহে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ক্রমেই অপটিক্যাল ফাইবারে চলে যাচ্ছে। আধুনিক সেমিকন্ডাক্টর ইলেকট্রনিক্স এবং ডিজিট্যাল ব্যবস্থার সঙ্গে চমৎকার খাপ খাইয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও প্রাথমিকভাবে এটি এসেছে। সারল্য ও অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয় একে সর্বত্র আকর্ষণীয় করে তুলছে। এই তন্তুর মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ অসম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য চ্যানেল একই সঙ্গে চালানো সম্ভব হওয়াতে অনেক টেলিফোনের ঘন সমাহারে ব্যস্ত যোগাযোগব্যবস্থায়ও এর মধ্যে যথেষ্ট সারল্য বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে। চুলের মতো সরু কাচ-তন্তুর একটি ঘন গুচ্ছ নিজেও খুব ছিমছাম স্বল্পায়তন একটি জিনিস। সনাতন কেবলের তুলনায় অনেক সরল বস্তু। এই নূতন তথ্যসংবাহী সংযোগ নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতের তথ্য বিনিময়ের একটি প্রধান অবলম্বন।

# ব্যাটারির নয়া যুগ

একটি নিত্যব্যবহার্য প্রযুক্তি সামগ্রীতে আমরা এখন নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে দাবি করতে পারি ; তা হলো সাধারণ টর্চ-ব্যাটারি। বিশেষ করে টর্চ ও রেডিওর জন্য এই ব্যাটারির চাহিদা দেশের সর্বত্র প্রচুর এবং তা ক্রমাগত বেড়েই চলবে। এরকম একটি প্রযুক্তিভিত্তিক গুরত্বপূর্ণ সামগ্রীর ক্ষেত্রে আমদানিনির্ভর না হতে পারাটা কম আনন্দের কথা নয়। কারণ আমাদের ব্যবহার্য খুব বেশি জিনিসের ক্ষেত্রে একথা বলা যাবে না। আসলে এই ব্যাটারির প্রযুক্তির উন্নয়নে আমাদেরকে আরো ভালোভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সারা দুনিয়া জুড়ে ব্যাটারীর ক্ষেত্রে একটা নয়া যুগ এসেছে এবং ভবিষ্যতের আরো অনেক নিত্য ব্যবহার্য প্রযুক্তির শক্তি যোগাবে নানা ধরনের অভিনব ব্যাটারি।

বিদ্যুৎ যুগের একেবারে গোড়াতে ১৮০০ সালের মার্চ মাসে, ইতালিয়ান বিজ্ঞানী আলেসজান্দ্রো ভোল্টা রয়্যাল সোসাইটির কাছে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন :

"হ্যাঁ, যে-উপকরণের কথা আমি বলছি, যা আপনাদেরকে নিঃসন্দেহে বিস্মিত করবে, সেটি আসলে নানা ধরনের সুপরিবাহী বস্তুর একটি বিশেষ সমন্বয় ছাড়া কিছু নয়। ৩০, ৪০, ৬০ কি আরো বেশিসংখ্যক তামার টুকরার, অথবা আরো ভালো হয় রূপার টুকরার, প্রত্যেকটি একটি টিন কিংবা দস্তার টুকরার উপর রাখতে হয়। তা ছাড়া নিতে হয় সমান সংখ্যক পানির স্তর ; কিংবা পানির চেয়েও সুপরিবাহী কোনোকিছুর, যেমন লবণ, পানি, ছাইয়ে-গোলা-পানি ; কিংবা এতে ভালোভাবে ভেজানো কার্ডবোর্ড বা চামড়ার টুকরা যা উপরোক্ত ধাতু দুটির মাঝখানে ব্যবহার করতে হয়। এই তিন রকমের সুপরিবাহী বস্তুর ক্রমকে সবসময় একই রাখতে হয়। আমার নতুন কৌশলটিতে ব্যস এইটুকুই রয়েছে যা লাইডেন জারের মতো অথবা ইলেকট্রিক ব্যাটারির মতো কাজ করে।.."

'ভোল্টার স্তূপ' নামে পরিচিত এই নতুন কৌশলটিই ছিল পরবর্তীকালের যাবতীয় ব্যাটারির আদি পিতা।

সেই প্রারম্ভের পর থেকে ব্যাটারি বা বিদ্যুৎকোষের নানারকম উন্নয়ন হয়েছে। তবে এর মধ্যে ধোপে টিকে যায় ল্যাকলাঙ্ক সেল নামের বিদ্যুৎকোষটি। আমাদের অতিপরিচিত টর্চ-ব্যাটারিটি ল্যাকলাঙ্ক সেলেরই 'শুষ্ক' রূপ (ড্রাই সেল)। ১৮৬৬ সালে ফ্রান্সের জর্জ ল্যাকলাঙ্ক মূল বিদ্যুৎকোষটি উদ্ভাবন করেন। সেটা অবশ্য তরল বিশিষ্ট—তাতে একটি কাচের বয়োমের মধ্যে সম্পৃক্ত অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণে ডোবানো থাকে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট সিরামিকের পাত্র এবং একটি দস্তার দণ্ড। সিরামিকের বেলনাকৃতি পাত্রটির মধ্যে থাকে ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড গুঁড়া আর কার্বন গুঁড়ার মিশ্রণ এবং তার মধ্যে গোঁজা একটি কার্বনদণ্ড। দস্তা ও কার্বনদণ্ড যথাক্রমে ব্যাটারি ঋণাত্মক ও ধনাত্মক মেরু হিসাবে কাজ করে। এরই শুষ্ক সংস্করণ (আসলে পুরো শুষ্ক নয়, ভেজা অংশও আছে) হল টর্চ-ব্যাটারি—বড় সাইজের অর্থাৎ D টাইপ, মাঝারি সাইজের অর্থাৎ C টাইপ বা পেন্সিল সাইজের অথবা AA টাইপ রূপে যাদের আমরা হরদম ব্যবহার করছি। এতে বাইরে কাগজে পলিথিনের জ্যাকেটের ভেতরে থাকে দস্তার একটি কৌটা। কৌটাটা ভর্তি থাকে ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড গুঁড়ায় আর মাঝখানে কালো কার্বনের দণ্ড।

ব্যাটারিজগতের আর যেই জনপ্রিয় সদস্যটি বহুকাল ধরে মনোযোগ পেয়ে এসেছে তা হল রিচার্জেবল লেড অ্যাসিড ব্যাটারি—অর্থাৎ আমাদের পরিচিত মোটরগাড়ির ব্যাটারি। এটা নিজে বিদ্যুৎ দিতে পারে না, বাইরের বিদ্যুৎ দিয়ে একে বারবার চার্জ করে নিতে হয়। তাই একে সেকেন্ডারি সেল বলা হয়। এই লেড অ্যাসিড ব্যাটারি উদ্ভাবিত হয়েছে ১৮৫৯ সালে। প্রায় একশো বছর ধরে ব্যাটারিশিল্পের গবেষণা বলতে মূলত ঐ ড্রাইসেল আর লেড অ্যাসিড ব্যাটারির ছোটখাটো উন্নয়নকর্ম বোঝাত। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এসে সব বদলে গেছে।

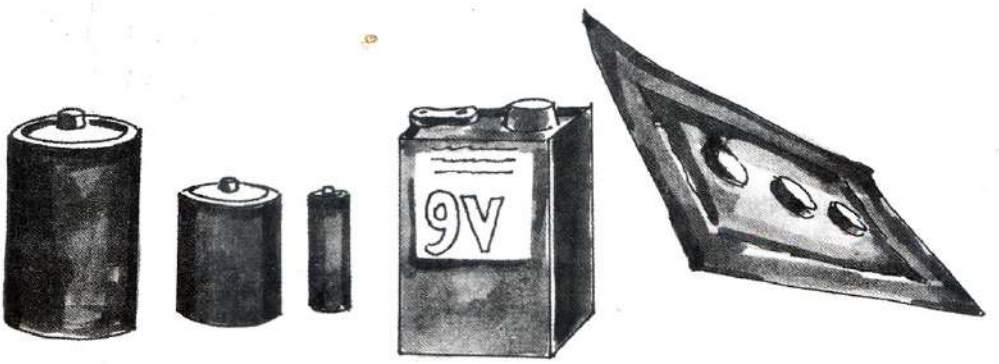


*ব্যাটারির নয়া যুগ*

বদলে যাবার কারণ হচ্ছে নূতন প্রয়োজন। প্রথমত ভারী কাজের প্রয়োজনে যে-ব্যাটারি তাতে একবার ব্যবহারে পরিত্যক্ত ব্যাটারি মোটেই কাজে আসে না—কারণ ব্যয় হবে অত্যন্ত বেশি আবার রিচার্জেবল ব্যাটারি ব্যবহার করতে হলে অনেক ধরনের কাজে তা বর্তমানের চেয়ে হালকা ও ছোট হওয়া প্রয়োজন। ব্যাটারির নয়া যুগ সৃষ্টি করতে যেসব নূতন প্রযুক্তি বিশেষভাবে তাগিদ সৃষ্টি করেছে তার কয়েকটি নিচে দেওয়া হল।

প্রথমত উল্লেখ করা যায় আধুনিক সেমিকন্ডাক্টর ইলেকট্রনিক্সের কথা। ইলেকট্রনিক্স ঘড়ি, ক্যালকুলেটর এবং অনুরূপ নিত্যব্যবহার্য জিনিস ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করার সাথে সাথে এদের উপযোগী ব্যাটারির কথা ভাবতে হয়েছে। এদেরকে আকারে ক্ষুদ্র হতে হবে, নইলে ব্যাটারির জন্যই জিনিসটা অনর্থক বড় হয়ে পড়বে। এ ছাড়া একে বহু দিন টিকতেও হবে—ঘড়ি বা ক্যালকুলেটরের ব্যাটারি ঘনঘন বদলাতে হওয়া তো কাজের কথা নয়। আবার যদ্দিন টিকবে এদের ভোল্টেজ একই মাপের থাকা উচিত। টর্চ-ব্যাটারি যতই দিন যায় তার ভোল্টেজ কমে আসে ; এতে টর্চের আলো ক্ষীণতর হয় বটে, তাতে অঘটন কিছু ঘটে না। কিন্তু ঘড়িতে তা চলবে কেন?

আজকাল নিত্যব্যবহার্য অনেক যন্ত্রপাতি পোর্টেবল হয়ে পড়েছে, অর্থাৎ এদেরকে সব জায়গায় বয়ে বেড়ানো যায়। এর মধ্যে পোর্টেবল রেডিও, টেলিভিশন, ক্যাসেট-রেকর্ডার, ভি সি আর রিফ্রিজারেটর, মাইক্রোফোন ইত্যাদি অনেক রকম জিনিস রয়েছে। পোর্টেবল হতে হলে তারে সরবরাহকৃত বিদ্যুতে আর চলে না, উপযুক্ত ব্যাটারি প্রয়োজন। এদের যেগুলোতে কাজটা ভারী তাতে এমন রিচার্জেবল ব্যাটারি

প্রয়োজন যা অতিরিক্ত চার্জ করলে বা অতিরিক্ত ডিসচার্জ করে ফেললে কোনো ক্ষতি হবে না। সাধারণ লেড-অ্যাসিড ব্যাটারির এই গুণ নেই।

ব্যাটারির আর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে নূতন ধরনের বিকল্প শক্তিউৎসের প্রয়োগের ক্ষেত্রে। এই মুহূর্তে ব্যাপক আকারে ব্যবহৃত না হলেও তেলের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি এরকম বিকল্প শক্তিউৎসকে আগামীদিনের জন্য অপরিহার্য করে তুলেছে এবং এর উপর প্রচুর গবেষণা চলছে। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, সমুদ্রতরঙ্গের শক্তি ইত্যাদি বিকল্প উৎস একনাগাড়ে পাওয়া যায় না। তাই যখন পাওয়া যায় তখন এদেরকে সঞ্চয় করে রাখা প্রয়োজন। ব্যাপক ও দক্ষ সঞ্চারব্যবস্থা তাই বিকল্প শক্তিউৎসের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। এক্ষেত্রে রিচার্জেবল ব্যাটারি একটি প্রধান সহায়। এই বিশেষ কাজের জন্য ব্যাটারিকে হতে হবে দক্ষ এবং বহুবার চার্জ-ডিসচার্জ করার উপযুক্ত।

বর্তমান যুগে আর একটি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ব্যাটারিতে চালিত গাড়ির। এরকম গাড়ি নিঃশব্দ হবে বলে এবং বিষাক্ত ধোঁয়া উদ্গীরণ করবে না বলে এরা পরিবেশকে দূষিত করবে না। তা ছাড়া এতে গাড়িতে তেলের বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার সম্ভব হবে। বহুকাল ধরেই এরকম ব্যাটারিচালিত গাড়ি চালু থাকলেও এরা ব্যাপ্তি না পাওয়ার কারণ ছিল উপযুক্ত ব্যাটারির অভাব। একটি ছোট মোটরগাড়ির ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে চালাতে যে-তেল নিতে হবে সমপরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য তাকে যদি লেড-অ্যাসিড ব্যাটারি নিতে হয় সেই ব্যাটারি ওজন হবে তেলের ওজনের অন্তত ৪০ গুণ এবং আয়তন হবে তেলের অন্তত ২৫ গুণ! এখন উন্নততর ব্যাটারি উদ্ভাবনের মাধ্যমে এ-সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

ব্যাটারি উন্নয়নের আর একটি বড় তাগিদ আসে প্রতিরক্ষার ও অস্ত্রসজ্জার নানা প্রয়োজন থেকে, আর এই খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে। সহজে বয়ে বেড়ানো যায় এবং যথেষ্ট শক্ত-সমর্থ ইলেকট্রনিক যোগাযোগ-সামগ্রীর ব্যাটারি তো রয়েছেই ; তা ছাড়া এখানে প্রয়োজন মিসাইলের জন্য দীর্ঘমেয়াদে রেখে দেওয়া সম্ভব অথচ মুহূর্তে কার্যকর করে দুএক সেকেন্ডের মধ্যে শক্তি নিঃশেষ করার মতো বিশেষ ব্যাটারি, পানির মধ্যে টর্পেডো মোটরের জন্য ব্যাটারি, কামানের গোলার মধ্যে কাজ করে এমন ব্যাটারি, গভীর শীতে ট্যাঙ্ক বা জঙ্গি বিমানকে স্টার্ট করার মতো ব্যাটারি ইত্যাদি বিচিত্র গুণাগুণের ব্যাটারি।

**প্রাথমিক ব্যাটারির উন্নয়ন :**

প্রাথমিক ব্যাটারি বলতে বোঝানো হয় রাসায়নিক বিক্রিয়ার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মৌলিক উৎস হিসাবে যেগুলো কাজ করে সেগুলোকে। পূর্ণ ব্যবহার হয়ে যাবার পর সাধারণত এদের ফেলে দেওয়া হয়। টর্চ-ব্যাটারি বা ড্রাইসেল এই দলের সবচেয়ে পরিচিত সদস্যকে হিসাবে দেখা গেছে যে পশ্চিমা বিশ্বে সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রত্যেক নরনারী ও শিশু মাথাপিছু বছরে পাঁচটি এই ড্রাইসেল খরচ করে। এতকাল ধরে এই বিপুল জনিপ্রয়তার কারণ এই উপকরণের সুলভতা এবং তৈরি করার সারল্য। বিভিন্ন সময়ে এর নানারকম উন্নয়ন হয়েছে। সাম্প্রতিক গুরুত্বপুর্ণ উন্নয়নটি হল সত্তরের দশকে আলকেলাইন ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের ব্যবহার। এই আলকেলাইন ব্যাটারিগুলো অপেক্ষাকৃত ভারী কাজ করতে সাধারণ ড্রাইসেলের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষতা দেখায়। তাই ফটো তোলার ফ্লাশবাতি, বড় বড় খেলনা, ক্যাসেট-রেকর্ডার ইত্যাদির জন্য এটার ব্যবহার লাভজনক।

১৯৩০ সালে উদ্ভাবিত হয়েছিল নূতন ধরনের একটা ব্যাটারি মারকারি ব্যাটারি। এটিই ছিল ক্ষুদ্র আকারে শক্তিউৎসের প্রথম নমুনা। ক্রমাগত ১.৪ ভোল্ট ভোল্টেজ বজায় রেখে এটা স্বল্প বা মাঝারি কারেন্টের বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম। এটা ঘড়ি, লাইট মিটার, হিয়ারিং-এইড প্রভৃতির ক্ষুদ্রাকৃতি যন্ত্রের প্রয়োজন ঘটায়। একই ধরনের আর একটি ব্যাটারি এখন ক্ষুদ্রাকৃতিতে বেশ ব্যবহৃত হচ্ছে, তা হল জিংক-সিলভার অক্সাইড। দীর্ঘ সময় ধরে সমান ভোল্টেজ বজায় রাখতে ও অল্প অবয়বে অধিক শক্তি ধরতে এর জুড়ি নেই।

ব্যাটারি উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি কাজ হয়েছে লিথিয়াম ব্যাটারির উপর। এরা ভিন্ন ইলেকট্রোড ব্যবহার করে ১.৫ ভোল্ট দিতে পারে। খুব স্বল্প কারেন্টের কাজের জন্য এরা সবচেয়ে ভালো। তাই ঘড়ি, ক্যালকুলেটর ইত্যাদিতে ইতিমধ্যেই এরা মারকারি ব্যাটারিকে প্রায় উচ্ছেদ করে ফেলেছে।

বর্তমানে সবচেয়ে উন্নত ব্যাটারিগুলোর অধিকাংশ লিথিয়াম আর তরল সালফার ডাই-অক্সাইডে তৈরি। আয়তনের তুলনায় এদের ধারণ করা শক্তির পরিমাণ অনেক বেশী। ছয় বছর রেখে দিলেও এদের শক্তিউৎস শতকরা ১০ ভাগের বেশি হ্রাস পায় না, আর অতি উষ্ণ বা প্রবল শীতল জায়গাতেও এরা কর্মক্ষম।

উল্লিখিত সব ব্যাটারিতেই রয়েছে কোনো-না-কোনো তরল ইলেকট্রোলাইট, অন্তত তরল ইলেকট্রোলাইটে ভেজানো জিনিস। ইলেকট্রোলাইট হল এমন দ্রব্য যার মধ্যে বিদ্যুতায়িত আয়ন চলাফেলা করে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করতে পারে। যেমন ল্যাকলাঙ্ক সেলে এই ইলেকট্রোলাইট হল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড। ১৯৬৭ সালে প্রথম সলিড ইলেকট্রোলাইট আবিষ্কৃত হয়। এদের কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়েও আয়ন চলাচলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে। এর ভিত্তিতে এখন এসেছে সম্পূর্ণ কঠিন অবস্থার উপকরণ দিয়ে সলিড স্টেট ব্যাটারি। এসব ব্যাটারির সুবিধা অনেকগুলো। এরা টেকসই হয়, কারণ এতে ক্ষয়ে ফেলার মতো কোনো তরল রাসায়নিক দ্রব্য নেই, আর একে তৈরিও করা যায় খুব ছিমছাম ছোট আকারে। তা ছাড়া এর থেকে 'লিক' করারও কিছু নেই, ধারণ করার জন্য বদ্ধ পাত্রেরও প্রয়োজন এতে হয় না। সবচেয়ে সফল যে সলিড-স্টেট ব্যাটারি এখন বাজারে চালু আছে তা লিথিয়াম পলিভিনাইল পিরেডিন ও আয়োডিনের সমন্বয়ে তৈরি। এর মধ্যে কঠিন ইলেকট্রোলাইট লিথিয়াম আয়োডাইড আপনা থেকেই তৈরি হয়। অবশ্য এরা এখনো শুধু স্বল্প কারেন্টের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে যেমন কমপিউটার মেমোরি অথবা হৃদযন্ত্রের পেস মেকারের কাজে। এই সীমাবদ্ধতার কারণ হল লিথিয়াম আয়োডাইডের নিজের রোধকতা অনেক বেশি। আরো সুপরিবাহী কঠিন ইলেকট্রোলাইট আবিষ্কৃত হলে ব্যাটারি জগতে বড় পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

একটি ক্ষেত্রে এখনো যার বিশেষ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই তা হল মোটর গাড়ির ব্যাটারি হিসাবে অতিপরিচিত লেড অ্যাসিড ব্যাটারি। দীর্ঘকাল ধরে এর জনপ্রিয়তার কারণ—এর বৈদ্যুতিক গুণাগুণ সুবিধাজনক, এর তৈরির কাঁচামাল সহজলভ্য এবং একে সহজে তৈরিও করা যায়। এর প্রধান যে-উন্নত রূপ এখন ব্যবহৃত হয় তাতে সনাতন অ্যান্টিমনি লেড সঙ্কর ধাতুর বদলে ক্যালসিয়াম লেড ব্যবহার করা হয় যা আপনা-আপনি ডিসচার্জ হয়ে যাওয়া থেকে একে কিছুটা রক্ষা করে। তা ছাড়া বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে এই ব্যাটারিতে পানি দেবার প্রয়োজনীয়তাটাও দূর করা হয়েছে। ফলে এখন রক্ষণাবেক্ষণ-প্রয়োজনবিহীন লেড অ্যাসিড ব্যাটারি পাওয়া যাচ্ছে।

যেসব বিশেষ ধরনের আধুনিক প্রয়োজনের কথা ইতোমধ্যে বলা হয়েছে তার জন্য রিচার্জেবল ব্যাটারির বিভিন্ন গুণাগুণ উন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এসব গুণের মধ্যে রয়েছে :

**চক্র-দক্ষতা :** চার্জ করার সময় যে-শক্তি এতে সঞ্চিত হয় তার কত অংশ ডিসচার্জের সময় তা থেকে পাওয়া যাবে সেই দক্ষতা।

**শক্তি-ঘনত্ব :** ব্যাটারির নিজের প্রতি একক ওজনের জন্য কতখানি ক্ষমতা এর থেকে পাওয়া যায়।

**চক্র-আয়ুষ্কাল :** একবার চার্জ করে তাকে ডিসচার্জ করাটাকে যদি একটি চক্র ধরা হয়, তা হলে একটি নির্দিষ্ট দক্ষতার নির্দিষ্ট আউটপুটের মোট কতগুলো চক্র এই ব্যাটারি থেকে পাওয়া সম্ভব।

**চার্জ ধারণক্ষমতা :** আপনাআপনি ডিসচার্জ হবার প্রবণতার বিরুদ্ধে এর চার্জ ধারণের ক্ষমতা।

এসব গুণাগুণের দিকে লক্ষ রেখে লেড অ্যাসিড ব্যাটারির যেসব বিকল্প এখন ব্যবহৃত হচ্ছে অথবা গবেষণা ও উপযোজনের পর্যায়ে রয়েছে তাদেরকে কয়েকটি দলে ফেলা যায়।

একটি দলে রয়েছে পলিমার ইলেকট্রোলাইটের ব্যবহার। এটা আসলে অর্গানিক দ্রাবকের ইলেকট্রোলাইট এবং কঠিন ইলেকট্রোলাইটের মাঝামাঝি একটা অবস্থা। বর্তমানের অন্য সব ব্যাটারির

তুলনায় এর শক্তি ঘনত্ব অন্তত দশগুণ বেশী বলে ওজন ও আয়তনের প্রশ্ন যেখানে বড় সেখানে এই ব্যাটারির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল।

দ্বিতীয় দলকে বলা যায় তরল আলকেলাইন ইলেকট্রোলাইটের ব্যাটারি। এর মধ্যে ছোট, শক্ত-সমর্থ ক্যাডমিয়াম নিকেল অক্সাইড ব্যাটারি আমাদের পরিচিত। ক্যাসেট রেকর্ডার ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত রিচার্জেবল পাওয়ার প্যাক নামে যে ব্যবহৃত হয় তার অধিকাংশ এ দিয়েই তৈরি। এর সুবিধা হল এর চক্র আয়ুষ্কাল যথেষ্ট বেশি, চার্জ ধারণ-ক্ষমতা মন্দ নয়, তা ছাড়া এতে অধিক কারেন্টে ডিসচার্জ করাও সম্ভব। কাজেই যথেষ্ট ভারী কাজ যেমন ঝালাইয়ের তাতাল (সোলডারিং আয়রন) গরম করার কাজে এটাই ভরসা। সিল-করা ছোট আকারের ছাড়াও একে সছিদ্র বড় আকারেও পাওয়া যায়—অধিক শক্তি উৎস হিসাবে ব্যবহারের জন্য। এই দলের আর দু'টা সদস্য আয়রন নিকেল অক্সাইড এবং জিংক নিকেল অক্সাইড ব্যাটারি বহু পূর্বে উদ্ভাবিত হলেও এখন তা নূতন উদ্যমে মনোযোগ লাভ করেছে। সুবিধাজনক শক্তি ঘনত্বের কারণে ভবিষ্যতের ইলেকট্রিক গাড়ির শক্তি-উৎস হিসাবে জেনারেল মোটরস কোম্পানিসহ অনেকে এদের উন্নয়নের চেষ্টা করছে।

আর একটি দল হল ধাতু-বাতাস ব্যাটারির। কম ওজনটা যেখানে গুরুত্বপুর্ণ সেখানে পরিজিটিভ ইলেকট্রোড হিসাবে বাতাসকে ব্যবহার করতে পারা সুবিধাজনক বইকী। বিশেষভাবে যেগুলোর উন্নয়নের চেষ্টা চলছে তারা হল জিংক এয়ার এবং আয়রন এয়ার ব্যাটারি। অবশ্য প্রচুর সমস্যা রয়ে গেছে। জিংকের (দস্তা) গঠনের কারণে এর রিচার্জিং কঠিন, আবার আয়রনের ক্ষেত্রে চক্রক্ষমতা এবং চার্জ ধারণক্ষমতা বেশি পাওয়া যাচ্ছে না।

অনুরূপ আর একটি দলে রয়েছে ধাতু-হেলোজেন ব্যাটারিগুলো। এখানে বাতাসের বদলে হ্যালোজেন গোষ্ঠীর গ্যাস অর্থাৎ ক্লোরিন, ব্রোমিন প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। জিংকের পূর্বোল্লিখিত অসুবিধাটি এক্ষেত্রে কম বলে জিংক ক্লোরিন ব্যাটারি বেশ সুবিধাজনক হতে পারে। বিশেষ করে ইলেকট্রিক গাড়ির জন্য জিংক ক্লোরিন ব্যাটারির কথা ভাবা হচ্ছে।

যথেষ্ট অধিক চক্র-দক্ষতা ও শক্তি-ঘনত্ব অর্জন করতে চাইলে শেষ পর্যন্ত যে-দলের ব্যাটারির দিকে আমাদের তাকাতে হবে তা হল উচ্চ উষ্ণতার ব্যাটারি। এদের মধ্যে লিথিয়াম এলয়-আয়রন সালফাইড ব্যাটারি কাজ করে ৪৫০° সেঃ উষ্ণতায়। এই উষ্ণতায় কঠিন অবস্থায় রাখার জন্য লিথিয়ামকে অ্যালুমিনিয়াম অথবা সিলিকনের সাথে সংকর করা হয়। এর ইলেকট্রোলাইট হিসাবে ব্যবহৃত হয় লিথিয়াম ক্লোরাইড ও পটাশিয়াম ক্লোরাইডের সংকর। সোডিয়াম সালফার বা সংক্ষেপে বিটা ব্যাটারি নামে পরিচিত এই দলের আর একটি ব্যাটারি ৩৫০° সেঃ-এ কাজ করে। মজার ব্যাপার হল এর ইলেকট্রোডগুলো তরল কিন্তু ইলেকট্রোলাইটটা কঠিন। এর উপকরণের সুলভতা এবং শক্তি-ঘনত্বের পরিমাণ (লেড এসিড ব্যাটারির প্রায় ছয় গুণ) একে ভবিষ্যতের খুব সম্ভাবনাময় একটি ব্যাটারি হিসাবে চিহ্নিত করেছে। অবশ্য এখনো এর প্রযুক্তিগত অনেক সমস্যার সমাধান বাকি রয়েছে।

দেখতে পাচ্ছি ব্যাটারির ক্ষেত্রে একটি নয়া যুগ এসেছে। নূতন নূতন ব্যাটারি ইতোমধ্যেই প্রয়োজনের তাগিদে দেখা দিয়েছে, ব্যবহৃতও হচ্ছে। গবেষণা চলছে আরো সম্ভাবনাময় শক্তি-উৎস হিসাবে আরো চমকপ্রদ বহু ব্যাটারি সম্পর্কে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক যে সারা দুনিয়াতেই এখনো সেই আদি অকৃত্রিম ড্রাইসেল এবং লেড অ্যাসিড ব্যাটারির আধিপত্য অব্যাহত রয়েছে। তাই আমাদের দেশে যে আমরা ড্রাইসেলে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারছি এবং লেড অ্যাসিড ব্যাটারি তৈরি করছি সেটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অবশ্য একই সাথে ব্যাটারির নয়া যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে আমাদের গবেষণা-প্রচেষ্টার দ্বারও উন্মুক্ত রাখতে হবে।

# আপনার ব্যাটারিকে চিনে নিন

মাত্র বিশ-পঁচিশ বছর আগের কথা চিন্তা করুন। ঘরে আপনার ব্যাটারির প্রসঙ্গ আসত টর্চলাইটের প্রসঙ্গে, বড়জোর ট্রানজিসটর রেডিও যদি থাকত, তার প্রসঙ্গে। টর্চলাইটের ব্যাটারির চিরন্তন রূপ সবার পরিচিত ছিল। আর এখন? রেডিওর মধ্যেই তো কত রকমারি-বিচিত্র আকার আকৃতির ব্যাটারি তার চাই। এ ছাড়া ক্যাসেট-প্লেয়ার রয়েছে, তারো যুতসই ব্যাটারি চাই। আগে ব্যাটারি দিয়ে শুধু টর্চের আলো জ্বলত, এখন বেশ হাতে নিয়ে বেড়ানোর মতো ফ্লোরোসেন্ট বাতিও জ্বলে। আরো আছে পকেট-ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি। এদের কেনার সময় ব্যাটারি প্রসঙ্গটা ভাবতে হয়। ক্যামেরা যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের আবার অন্য সমস্যা—ফ্ল্যাশ বাল্‌বে কি ব্যাটারি চলবে? লাইট মিটারের জন্যও বা ক্যামেরায় কী ভরতে হবে? আর কানে শোনার অসুবিধার জন্য হিয়ারিং এইড ব্যবহার যাঁরা করেন তাঁদেরও ব্যাটারি-সমস্যা আছে। একই সমস্যা চিন্তিত করে অনেক ছোটদেরও, ব্যাটারিচালিত খেলনা ব্যবহারের সৌভাগ্য যাদের হয় ; আজকাল বাজার কিন্তু এসবে ভর্তি।

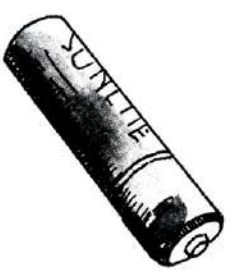


*পেনসিল ব্যাটারি*

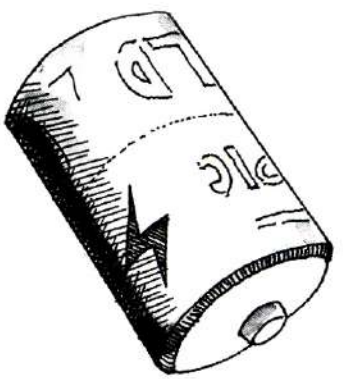

*টর্চ ব্যাটারি*

কাজেই দশ বছর আগের তুলনায়ও ব্যাটারির বাজার এখন যথেষ্ট জটিল। ঘরে ব্যাটারিচালিত সামগ্রী বেড়েছে, আর তাই নিত্য ব্যাটারির খরচও টানতে হচ্ছে। কোন ব্যাটারি কত দামে পাওয়া যাবে, আদৌ পাওয়া যাবে কি না, এতে ক'দিন যাবে, ব্যবহার না হলে এমনি পড়ে থেকেই ক'দিনে নষ্ট হয়ে যাবে ইত্যাদি চিন্তা আর এড়ানো যাচ্ছে না। চিন্তা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে 'লং লাইফ' 'হেভি ডিউটি', 'আলকেলাইন' প্রভৃতি নানা ধরনের নূতন কথা ব্যাটারির গায়ে লেখা থেকে তার দামের তারতম্য

ঘটিয়ে। দামের তারতম্যটা উপকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না, আর হলেও সেই উপকারটি আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না এসব জানা দরকার হয়ে পড়েছে। ব্যাটারি সম্বন্ধে কিছু খবর জানা থাকলে বেশকিছু হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, খরচের দিক থেকেও কিছু সুবিধে হতে পারে।

বিদেশের বাজারে প্রায় ৪০০ কিসিমের ব্যাটারি পাওয়া যায়, আর এই জটিলতার খানিকটা আমাদের এখানেও দেখা যায়। তবে আশার কথা হল এর মধ্যে শুধু পরিচিত চারটি সাইজের ব্যাটারিই শতকরা ৮৫ ভাগ অংশ দখল করে আছে দুনিয়ার বাজারে। এরা আমাদের পরিচিত D টাইপ অর্থাৎ টর্চের বড় সাইজের ব্যাটারি, C টাইপ অর্থাৎ মাঝারী সাইজের ব্যাটারি, AA টাইপ অর্থাৎ পেন্সিল সাইজের ব্যাটারি এবং ৯ ভোল্টের ছোট চ্যাপটা ব্যাটারি। প্রথমোক্ত তিনটা আকারে ভিন্ন হলেও এদের প্রত্যেকটারই ভোল্টেজ দেড় ভোল্ট। নির্মাণকৌশলের দিক থেকে আজকাল নিম্নলিখিত কয়েক ধরনের ব্যাটারিই কমবেশি চালু রয়েছে।

**কার্বন-জিংক ব্যাটারি**

এটা আমাদের চির-পরিচিত সাধারণ ব্যাটারী—গত একশো বছর ধরেই এরকম ব্যাটারি তৈরি হচ্ছে। আর আজও এতসব রকমারির পরও এটাই সবচেয়ে বহুলব্যবহৃত ব্যাটারি। দামেও অন্য সবকিছুর চেয়ে সস্তা। কখনো পুরানো এরকম একটা ব্যাটারি ভেঙে যদি দেখে থাকেন তা হলে হয়তো লক্ষ করেছেন এর বাইরের কাগজে পলিথিনের জ্যাকেটের ভেতর একটা ময়দার মতো পেস্টের ভেতরে রয়েছে জিংক অর্থাৎ দস্তার একটি কৌটো। কৌটোটা ভর্তি থাকে ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড গুঁড়ায় এবং এর মাঝখানটায় রয়েছে কালো কার্বনের একটা দণ্ড। ঐ কার্বনই ওপরে ধাতুর টুপির মধ্য দিয়ে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত, আর দস্তার কৌটোর তলাটাই আবার টিনের আবরণের মধ্য দিয়ে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত তৈরি করেছে। এজন্যই একে বলা হয় কার্বন-জিংক ব্যাটারি।

কার্বন-জিংক ব্যাটারি কিন্তু সেক্ষেত্রে চমৎকার যেখানে এর থেকে কারেন্ট নেয়া হয় খুব অল্প। এর থেকে যদি খুব ধীরে ধীরে অল্প অল্প কাজ নেয়া হয় তা হলে এটা মোট কাজ দিতে পারবে সবেচেয়ে ভালো। উদাহরণস্বরূপ একটা ট্রানজিসটর রেডিও চালাবার জন্য এটা খুবই ভালো। কিন্তু যদি এমন কিছু এর দ্বারা চালাতে চান যা নিরবচ্ছিন্নভাবে অধিক কারেন্ট নেবে অর্থাৎ ভারী কাজ করবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ব্যাটারির দক্ষতা বেশি নয়। ক্রমাগত ভারী কাজ করালে সব ব্যাটারির দক্ষতাই কম হয়, কিন্তু কার্বন-জিংক ব্যাটারির মতো অন্যগুলোর অবস্থা এতে খারাপ হয় না। একটা বাতি যদি এর দ্বারা জ্বালিয়ে রাখতে চান, ক্যাসেটের মোটর যদি এর দ্বারা ঘোরাতে থাকেন, কিংবা বাচ্চারা যদি তাদের বাতি জ্বলা শব্দ-করা পুলিশ-কার বেশ খানিকক্ষণ ধরে চালাতে থাকে তা হলে এর থেকে কম ফায়দা পাবেন। তাই এ-ধরনের কাজের জন্য এই ব্যাটারি ব্যবহারটা শেষ পর্যন্ত সস্তা পড়ে না। কিন্তু রেডিও চালানো, পকেট-ক্যালকুলেটর চালানোর মতো হালকা কাজে এটাই সবচেয়ে সস্তা ব্যাটারি। তা-ছাড়া টর্চের জন্য বা অল্প ব্যবহৃত-হওয়া খেলনার জন্য এটা ভালো যদিও সেক্ষেত্রে একটু ভারী কাজই করতে হচ্ছে—কিন্তু সে-কাজ হঠাৎ-হঠাৎ খানিকক্ষণের জন্য মাত্র করতে হয় বলে দক্ষতার এমন কিছু ঘাটতি পড়ে না। তাই এসবের জন্যও বেশি দামের ব্যাটারি ব্যবহারের মানে হয় না।

কার্বন-জিংক ব্যাটারির ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস ভাবতে হয় তা হল উত্তাপ। ঠাণ্ডায় এটি ভালো কাজ করে না, ২০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের নিচে তো একেবারেই করে না। অবশ্য আমাদের দেশের আবহাওয়ায় সেটা চিন্তনীয় বিষয় নয় ; বরং এদিক থেকে আমাদের দেশের জন্য এটি ভালো, কারণ

উত্তাপ যত বেশি এর দক্ষতাও তত বেশি; সবচেয়ে বেশি ১০০° ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপে। অবশ্য এর খারাপ দিকও আছে। গরমে এটা কাজ ভাল করে বটে কিন্তু গরমের মধ্যে এর সেল্‌ফ লাইফ বা তোলা আয়ু কম ; অর্থাৎ ব্যবহৃত না হয়ে পড়ে থাকলে ধীরে ধীরে যেভাবে কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায় গরমে তা দ্রুততর হয়। ঠাণ্ডার মধ্যে তুলে রাখা সম্ভব হলে কার্বন-জিংক ব্যাটারির সেল্‌ফ ভালোই, কিন্তু গরমে এটা সুবিধের নয়।

*স্টোরেজ ব্যাটারি*

*বোতাম ব্যাটারি*

**হেভি ডিউটি**

কিছু-কিছু ব্যাটারির গায়ের উপর দেখবেন 'হেভি ডিউটি' কথাটা লেখা আছে। নামেই বোঝা যাচ্ছে যে এদের ভারী কাজের জন্য সাধারণ ব্যাটারির চেয়ে উপযুক্ততর হওয়ার কথা। সাধারণ জিংক-কার্বন ব্যাটারিরই একটু ভিন্নরূপ এরা, আর এতে জিংক ক্লোরাইডকে একটা ইলেকট্রোলাইট হিসেবে ব্যবহার করা হয় ; তাই এদেরকে জিংক ক্লোরাইড ব্যাটারিও বলা হয়।

দেখা গেছে, এই ব্যাটারিগুলো শতকরা ৫০ ভাগ সার্থকনামা, অর্থাৎ এদের ভারী কাজে দক্ষতা বজায় রাখার ক্ষমতা সাধারণ ব্যাটারির দেড়গুণের মতো। কাজেই দামও দেড়গুণের বেশি না হলে অপেক্ষাকৃত ভারী কাজে এদের ব্যবহার করা উচিত। বেশি ঠাণ্ডায় এদের কার্যকারিতা সাধারণ ব্যাটারির চেয়ে খানিকটা ভালো, কিন্তু সেটা আমাদের জন্য ধর্তব্য নয়। সেল্‌ফ লাইফের দিক থেকে এটি সাধারণ জিংক-কার্বন ব্যাটারির সমতুল্য, তার চেয়ে ভালো কিছু নয়।

**আলকেলাইন**

কার্বন-জিংক ব্যাটারির দুর্বলতাগুলো সত্যিকার অর্থে কাটাতে হলে যে-ব্যাটারি ব্যবহার করা প্রয়োজন তা হল আলকেলাইন ব্যাটারি। এদের গায়ের ওপর আলকেলাইন কথাটা লেখা থাকে। এদের ক্ষমতা খুব ভালো।

বেশি ভারী কাজ করতে গিয়ে সাধারণ ব্যাটারি যেখানে শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষমতা হারিয়ে বসে, আলকেলাইন সেখানে চমৎকার কাজ করে যায়। এদিক থেকে এর সুবিধা সাধারণ ব্যাটারির চেয়ে মোটামুটি পাঁচ গুণ বেশি বলা যায়। তাই ফটো তোলার ফ্ল্যাশ-বাতি, বড় বড় খেলনা, পোর্টেবল ফ্লোরোসেন্ট বাতি, ইত্যাদির জন্য আলকেলাইন ব্যাটারীর ব্যহারটা উচিত কাজ। তা ছাড়া সময়-সময় ব্যবহার করে যদি দীর্ঘকালের জন্য তুলে রাখতে হয় তা হলেও আলকেলাইন কেনা ভালো—কারণ এর সেল্‌ফ লাইফ পাঁচ বছরেরও বেশি হতে পারে।

অবশ্য আলকেলাইন ব্যাটারির দামও অনেক বেশি। উল্লিখিত সুবিধাগুলো অর্থাৎ ভারী কাজ, বেশি দিন তুলে রাখা ইত্যাদির প্রয়োজন যদি না থাকে তা হলে এটা কিনে কাজ নেই। এই ব্যাটারির গঠনও মূলত সাধারণ ব্যাটারির অনুরূপ, শুধু এতে ক্ষারজাতীয় কিছু উপাদানের প্রাধান্য থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে আরেকটা কথা বলতে হয় যা সাধারণ ব্যাটারি এবং আলকেলাইন উভয়ের সম্পর্কে প্রযোজ্য। উভয়ের ভোল্টেজ ধীরে ধীরে কমে আসে, চট করে হঠাৎ একেবারে কমে যায় না। কাজেই যেসব ব্যবহারে প্রয়োজনীয় ভোল্টেজের বেশ খানিকটা কমেও কাজ চলে যায় সেক্ষেত্রে এদের কাছ থেকে কাজও বেশি পাওয়া যায়। একটি বিশেষ ভোল্টেজের সামান্য কম হলেই অচল, এমন ব্যবহারের জন্য এরা ভালো নয়।

### সিলভার অক্সাইড

সবশেষে যে কথাটি বলা হয়েছে তার দিক থেকে সর্বোত্তম ব্যাটারি হচ্ছে সিলভার অক্সাইড। আপনার টর্চলাইটে যদি এটা ব্যবহার করেন তা হলে আলকেলাইন ব্যাটারির চেয়েও তিনগুণ বেশি সময় ধরে এটি আলো দেবে। আর সে-আলো এই পুরো সময়ের মধ্যে একটুও কমবে না—একেবারে পুরো নিভে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। ভোল্টেজ একটুও না কমিয়ে ব্যবহার করার প্রয়োজন যেখানে, সেখানে সিলভার অক্সাইডের জয়জয়কার।

ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, হিয়ারিং এইড, কামেরার লাইট মিটার ইত্যাদির 'বোতাম-ব্যাটারি' হিসেবে এটা খুব প্রচলিত। বোতামের আকৃতির ছোট্ট চাকতি হিসেবে পাওয়া যায় বলেই এই নাম। অনেক ব্যবহারে ভোল্টেজ শেষ পর্যন্ত পুরাপুরি অক্ষুণ্ন রাখাটা জরুরি। নইলে ঘড়ি সময় ঠিক দেবে না, লাইট মিটার উলটো রিডিং দিতে চাইবে।

এসব কাজে এই ব্যাটারি ব্যবহারের আরো একটা বড় কারণ আছে। শক্তির উৎস হিসেবে সিলভার অক্সাইড ব্যাটারিতে যত অল্প জায়গায় যত বেশি শক্তি জমা করে রাখা যায় আর কোনো ব্যাটারিতে তত নয়। অ্যাপোলো-১৫-এর অভিযাত্রীরা চাঁদে গিয়ে সেখানে যে-অদ্ভুত গাড়িতে ঘুরে বেড়ালেন তার শক্তি যুগিয়েছিল সিলভার অক্সাইড ব্যাটারি। কেন তা এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

এতসব ভালো দিকের মধ্যে খারাপ দিক শুধু একটিই—তা হল অতিরিক্ত দাম। বাতাসার মতো ছোট্টটি হলে কী হবে এর তুলনামূলক দামটা কিন্তু যথেষ্ট বেশি; সিলভার অর্থাৎ রুপার দামই এর জন্য প্রধানত দায়ী। সিলভার অক্সাইড বোতাম ব্যাটারিগুলোর ভোল্টেজও সাধারণত ১.৫ ভোল্ট।

### মার্কারি ব্যাটারি

সিলভার অক্সাইডের অতিরিক্ত দামের জন্য অনেকে একই কাজের জন্য মার্কারি বোতাম-ব্যাটারি ব্যবহার করেন। এদের দাম সিলভার অক্সাইডের চেয়ে বেশ খানিকটা কম হয়। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এদের ভোল্টেজ সাধারণত কিছু কম ১.৩৫ ভোল্ট বা ১.৪ ভোল্ট হয়ে থাকে। ঘড়ি, ক্যামেরা ইত্যাদিতে ব্যবহারের জন্য যেখানে সিলভার অক্সাইড এবং ১.৫ ভোল্ট নির্দিষ্ট করা আছে সেখানে তার বদলে মার্কারি ব্যবহার করলে বিপত্তি ঘটতে পারে—কেননা এসব যন্ত্র একটুও কম ভোল্টেজ সহ্য করতে পারে না। কিন্তু হিয়ারিং এইডের মতো জিনিস যেখানে ভোল্টেজ একটু কম হওয়ার দরুন তেমন কিছু ইতরবিশেষ হয় না সেখানে সিলভার অক্সাইডের বদলে মার্কারি চলতে পারে।

মার্কারি ব্যাটারি পেন্সিল সাইজেও (AA) পাওয়া যায়। আজকাল বোতাম-ব্যাটারি আকারে কিছু-কিছু আলকেলাইন ব্যাটারি বাজারে ছাড়া হয়েছে। সাইজ এবং ভোল্টেজ মিললেও সিলভার অক্সাইড বা মার্কারি ব্যাটারির বদলে এদেরকে ব্যবহার করার আগে মনে রাখা উচিত এদের ভোল্টেজ বেশিদিন এক থাকবে না। কাজেই ঘড়ির মতো জিনিসে এদের ব্যবহার করে লাভ নেই। সিলভার অক্সাইড এবং মার্কারি ব্যাটারিগুলো সাধারণত যেসব কাজে ব্যবহৃত হয় সেখানে অতিরিক্ত কারেন্ট অর্থাৎ ভারী কাজের ব্যাপার নেই। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এদেরকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যে, ভারী কাজের জন্যও এদের দক্ষতা চমৎকার—আলকেলাইনের মতো বা তার চেয়েও বেশি। প্রসঙ্গত, চাঁদে গাড়ি চালাবার কথাটা আবার স্মরণ করা যায়। আর সেল্‌ফ লাইফের কথায় আসলে সিলভার-অক্সাইড এবং মার্কারি উভয়ের সেল্‌ফ লাইফ আলকেলাইনের মতোই দীর্ঘ—গরম ঠাণ্ডা যে-কোনো আবহাওয়ায়। কাজেই ক্যামেরার ভেতর বোতাম-ব্যাটারি ঢুকিয়ে, মোটেই ব্যবহার না করলেও আপনি কয়েক বছর ধরে এর কার্যক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

**নিকেল ক্যাডমিয়াম**

এতক্ষণ যেসব ব্যাটারির কথা বলা হল সেগুলো ফুরিয়ে গেলে ব্যস শেষ, আর কোনো কাজে আসে না। এদিক থেকে নিকেল ক্যাডমিয়াম (সংক্ষেপে 'নিক্যাড') ব্যাটারি অনন্য ; এদেরকে পুনর্বার চার্জ করে নূতনে পরিণত করা যায়। এরাই হল সাধারণ ব্যবহার্য রিচার্জেবল ব্যাটারি। প্রথমবার বেশি দাম দিয়ে কেনা হয়ে গেলে অনেক দিন এই ব্যাটারি ব্যবহার করা সম্ভব। কারণ হাজার বারের ওপরে এদেরকে চার্জ করা যায়—চার্জারের মধ্যে রেখে বাড়ির কারেন্ট সাপ্লাইয়ের সাথে কিছুক্ষণ লাগিয়ে রাখলেই হল। প্রতিবার চার্জ করতে যে-পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হয় তাও প্রায় ধর্তব্য নয়। কাজেই ব্যবহারপ্রতি নিক্যাড ব্যাটারির যে-খরচ পড়ে তা অন্য যে-কোনো ব্যাটারির চেয়ে কম।

সাধারণ ব্যাটারি বা আলকেলাইনের মতো নিক্যাড D. C. AA এবং ছোট চ্যাপটা এই কটি পরিচিত সাইজেই পাওয়া যায়। কিন্তু এদের ভোল্টেজ সাধারণ দেড় ভোল্টের পরিবর্তে ১.২৫ ভোল্ট। এজন্য অবশ্য বিশেষ কোনো অসুবিধা নেই, কারণ সাধারণ ব্যাটারি যেসব কাজে ব্যবহৃত হয় সেখানে খানিকটা কম ভোল্টেজে তেমন কিছু আসে যায় না। অন্যদিকে যেরকম অতিরিক্ত ভারী কাজে এই নিক্যাডকে চমৎকারভাবে ব্যবহার করা যায় তা আলকেলাইন ব্যাটারিকেও হার মানায়। এজন্য ঝালাই করার তাতাল (সোলডারিং আয়রন) ইত্যাদির মতো উচ্চ কারেন্টের কাজে যদি ব্যাটারি ব্যবহার করতে হয় তখন নিক্যাডই ভরসা। যদিও দরকারমতো চার্জ করা যায় বলে নিক্যাডের সেল্‌ফ লাইফের গুরুত্ব কম, তবুও বলে রাখা ভালো যে, এর সেল্‌ফ লাইফ এলকেলাইনের মতোই চমৎকার। অপেক্ষাকৃত দামি ক্যালকুলেটর ইত্যাদির সাথে চার্জারসহ নিক্যাড ব্যাটারি অনেক সময় দিয়ে দেয়া হয়।

**হালকা কাজ, ভারী কাজ**

এ-পর্যন্ত আলোচনায় দেখা গেছে যে, সাধারণ ব্যাটারি, আলকেলাইন অথবা নিক্যাডের ক্ষেত্রে করণীয় কাজটা হালকা বা ভারী তা জেনে ব্যাটারি বাছাই করা প্রয়োজন। দেখা গেছে যে, হালকা কাজের জন্য সস্তা সাধারণ বাটারিই লাভজনক, কিন্তু ভারী কাজের জন্য দামি ব্যাটারিই শেষ পর্যন্ত সস্তা পড়ে। তাই কোন কাজটা কতখানি হালকা বা ভারী তা আরো স্পষ্ট করে জানলে সুবিধা হবে। কাজটাতে কত মিলি এম্পায়ার কারেন্ট খরচ হয় তার একটা মোটামুটি হিসেব থেকে আমরা বুঝব সেটা কত ভারী কাজ।

ট্রানজিসটর রেডিওতে সাধারণত ১০ থেকে ৫০-এর মতো মিলি এম্পায়ার কারেন্ট খরচ হয়। এটা তাই হালকা কাজের একটা ভালো উদাহরণ। ক্যাসেট-রেকর্ডারে ৭০ থেকে ২০০ মিলি এম্পায়ার এর উর্ধ্বে কারেন্টও প্রয়োজন হতে পারে। কাজটা তাই রেডিওর তুলনায় ভারী। ক্যালকুলেটরে কারেন্টের পরিমাণ কম, এটা হালকা কাজ। কিন্তু কত হালকা তা অবশ্য নির্ভর করে ক্যালকুলেটরের সংখ্যাগুলো দেখানোর পদ্ধতির ওপর। এটা যদি LED (Light Emitting Diode) ধরনের হয় যেগুলোতে উজ্জ্বল লাল আলোর মাধ্যমে সংখ্যা ফুটে ওঠে—তা হলে কারেন্ট অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি লাগে : চ্যাপটা ৯ ভোল্ট ব্যাটারি চালিতগুলো ২০.৩০ এবং AA (পেন্সিল) ব্যাটারিচালিতগুলো ৪০-১০০ মিলি এম্পায়ার কারেন্ট নেয়। আর যদি এটা অধুনা বহুলব্যবহৃত LCD (Liquid Crystal Display) ধরনের হয়, যেগুলোতে অনুজ্জল ধাতব রঙের সংখ্যা দেখা যায়—তা হলে কারেন্ট লাগে অত্যন্ত কম, মাত্র ১ মিলি এম্পায়ারেরও কম। ঘড়িতে LDE ধরনে ১০-৪০ এবং LCD ধরনে অনেক কম কারেন্ট খরচ হয়।

সত্যিকার ভারী কাজগুলো সাধারণত আলো, তাপ বা মোটরসংক্রান্ত। সাধারণ টর্চলাইটে ৫০০ থোকে ১০০০ মিলি এম্পায়ার কারেন্ট লাগতে পারে। এটা নিঃসন্দেহে ভারী কাজ, যদিও একটানা বেশি ব্যবহৃত হয় না বলে এর জন্য সাধারণ ব্যাটারিই যথেষ্ট। ব্যাটারিচালিত পোর্টেবল ফ্লোরোসেন্ট বাতিও (৬ ওয়াটের) ৫০০ থেকে ১০০০ মিলি এম্পায়ার কারেন্ট খরচ করে। বাচ্চাদের আপেক্ষাকৃত ভারী, দামি যেসব খেলনা নানারকমভাবে গতিশীল হয়, আলো জ্বালে, সেগুলোতে ৪০০ থেকে ১০০০ মিলি এম্পায়ার পর্যন্ত কারেন্ট লাগতে পারে। যেসব পোর্টেবল টেলিভিশন ব্যাটারিচালিত সেখানে ৫০০ থেকে ১৫০০ মিলি এম্পায়ার কারেন্টের প্রয়োজন। ক্যামেরার ফ্ল্যাশের জন্য খুব বেশি কারেন্ট লাগে—প্রায় ২০০০ মিলি এম্পায়ারের মতো। এগুলো সবই বেশ ভারী কাজের উদাহরণ।

ভারী কাজের জন্য আরেক ধরনের ব্যাটারি আছে যা বর্তমান আলোচনায় আনা হয়নি—সেগুলো হল স্টোরেজ ব্যাটারি। মোটরগাড়িতে ব্যবহৃত বড়, ভারী ব্যাটারিগুলো তার অন্যতম। এদেরকে প্রয়োজনমতো চার্জ করে নেয়া যায় এবং মোটর ঘোরানো, বাতি জ্বালানো, টেলিভিশন চালোনোর মতো ভারী কাজ এদের দিয়ে করানো যায়। আমরা অবশ্য এখানে শুধু ঐসব ব্যাটারীর কথা আলোচনা করছি, যেগুলো হালকা-পাতলা, শুকনা, ঘরের কাজে নিত্য ব্যবহৃত হয়, যাদের বাজার থেকে অমনি নিয়ে এলেই হল, কোনোরকম রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, পানি দেয়া, অ্যাসিড দেয়া এসব হ্যাঙ্গাম যেখানে পোহাতে হয় না। এজন্য স্টোরেজ ব্যাটারিকে ঠিক এই পর্যায়ে ফেলা হয়নি।

### ঢাকার বাজারে কোনটা কিনবেন

ঢাকার বাজারে মোটামুটি ব্যাপক একটা অনুসন্ধান চালিয়ে আমরা নানা ধরনের ব্যাটারির খোঁজখবর নিয়েছি। এদের দাম, প্রাপ্যতা উপযোগিতা বিচার করে এ-সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা যায়।

সাধারণ ব্যাটারিগুলোর মধ্যে D সাইজের অর্থাৎ বড় টর্চব্যাটারির দাম জোড়া ১১ টাকা থেকে ১৫ টাকা, C সাইজ অর্থাৎ মাঝারীর দাম জোড়া ১৪-১৫ টাকা এবং AA সাইজ অর্থাৎ পেন্সিল-ব্যাটারির দাম জোড়া ১২ থেকে ১৬ টাকা। দুর্লভ বিদেশী ব্র্যান্ড হলে দাম আরো বেশি। দেখা যাচ্ছে যে, সাইজ বিভিন্ন হলেও দাম এদের প্রায় সমান। চ্যাপটা ৯ ভোল্টের ব্যাটারি পাওয়া যায়—এর দাম প্রতিটা ১৫ থেকে ২৫ টাকা ব্র্যান্ডভেদে। কার্যকারিতা বেশি বলে সেই হিসেবে বড় D সাইজের ব্যাটারি ব্যবহার করতে পারাটাই সবচেয়ে লাভজনক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ৯ ভোল্টে চলা একটা রেডিও মাঝারি ভল্যুমে চালাতে যদি ১৫ মিলি এম্পায়ারের মতো কারেন্ট খরচ করে তা হলে সেটা পেন্সিল

ব্যাটারিতে চালালে ৪০-৪৫ ঘণ্টা চালানো যাবে, ৯ ভোল্টের চ্যাপটা ব্যাটারিতে চালালে ৩০-৩৫ ঘণ্টা, আর বড় টর্চের ব্যাটারিতে চালালে ১৫০-২০০ ঘণ্টার মতো চালানো যাবে। অথচ পেন্সিল-ব্যাটারি ও বড় ব্যাটারির বাজারদর সমান, আর ৯ ভোল্টের একটি ব্যাটারির বদলে ছয়টি বড় ব্যাটারি কিনতে তার দ্বিগুণের মতো দাম লাগে। রেডিওটিকে যখন নিয়ে বেড়াতে হয় না তখন ছোট ব্যাটারির বদলে সাধারণ ছটি বড় ব্যাটারির তৈরি 'পাওয়ার প্যাক' দিয়ে চালানো অনেক বেশি লাভজনক।

সাধারণ মাপের হেভি ডিউটি এবং আলকেলাইন ব্যাটারি ঢাকার বাজারে শুধু পেন্সিল সাইজে পাওয়া যায়—তাও বেশ দুষ্প্রাপ্য। আলকেলাইন জোড়া ৫০ টাকা এবং হেভি ডিউটি জোড়া ২৫ টাকা। অবশ্য পেন্সিল-ব্যাটারির চেয়ে সামান্য ছোট একটা বিশেষ সাইজে (AAA) আলকেলাইন ব্যাটারি প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে, দাম জোড়া ৩০-৩৫ টাকা। ভারী কাজে আলকেলাইনের সুবিধার কথা আগেই বলা হয়েছে। ফটো ফ্ল্যাশে, মোটর-ওয়ালা দামি খেলনায়—উল্লেখিত পেন্সিল আলকেলাইনগুলো লাভজনক হতে পারে, বেশী দাম সত্ত্বেও। বড় সাইজের আলকেলাইন পাওয়া গেলে, এর দাম সাধারণ ব্যাটারীর চেয়ে এই অনুপাতের বেশি না হলে ফ্লোরোফ্লেন্ট বাতি, ক্যাসেট-প্লেয়ার ইত্যাদি কাজও লাভজনকভাবে ব্যবহার করা যেত। তা ছাড়া আলকেলাইনের সুদীর্ঘ সেল্‌ফ লাইফের ব্যাপারটাও হেলা করার নয় যদি দীর্ঘদিন পরপরই শুধু এক-একবার যন্ত্রটা ব্যবহার করতে হয়।

ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, হিয়ারিং এইড, ক্যামেরা ইত্যদির জন্য বিভিন্ন আকারের সিলভার অক্সাইড বোতাম-ব্যাটারি এখন ঢাকার বাজারে পাওয়া যাচ্ছে—দাম প্রতিটা ৩০ থেকে ৪০ টাকা। একই কাজের কিছু-কিছু মার্কারি ও আলকেলাইন বোতাম-ব্যাটারিও পাওয়া যাচ্ছে। দাম একই বলে এবং সিলভার অক্সাইডের সুবিধাগুলোর কারণে ক্যামেরার প্রয়োজনে ৫.৬ ভোল্টের এবং ১.৪ ভোল্টের বিশেষ সাইজের ব্যাটারীও রয়েছে। প্রথমটি প্রতিটি ৮০ টাকার মতো এবং দ্বিতীয়টি ৩৫-৪০ টাকা।

## সামনে কী আসছে?

এ-পর্যন্ত যেসব ব্যাটারির কথা বলা হয়েছে সেগুলো ইতোমধ্যেই যথেষ্ট চালু রয়েছে। কিন্তু আরো কিছু ব্যাটারি সদ্য বাজারজাত করা হয়েছে। লেড-অ্যাসিড ল্যান্টার্ন ব্যাটারি নামে একটা ব্যাটারির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বাতি জ্বালাবার কাজে জনপ্রিয় হবার। মোটরগাড়ির স্টোরেজ ব্যাটারির নীতিতে তৈরি হলেও এতে জেলির মতো ইলেকট্রোলাইট ব্যবহার করা হয়েছে তাই পানি দিতে হয় না—তবে বারবার চার্জ করে নেয়া যায়। লিথিয়াম সেল নামে পরিচিত বোতাম ব্যাটারিটি আগামীতে ক্যালকুলেটর, ঘড়ি ইত্যাদির কাজে একচেটিয়া হয়ে যেতে পারে—প্রধান কারণ এর অবিশ্বাস্য রকমের সেল্‌ফ লাইফ বিশ-ত্রিশ বছরেরও বেশি হতে পারে। সাধারণ ব্যাটারি অর্থাৎ কার্বন-জিংকের নীতিতে তৈরি একটি নূতন বৈশিষ্ট্যময় ব্যাটারি বাজারে ছাড়া হয়েছ। অন্যান্য সব ব্যাপারে একই হওয়া সত্ত্বেও এটা মুহূর্তকালের জন্য অত্যন্ত উচ্চ কারেন্ট (২৫ এম্পায়ারের মতো!) দিতে সক্ষম। খুবই বিশেষ ধরনের কিছু কাজে এর ব্যবহার হবে।

আর সবকিছু থেকে ভিন্ন যে-ব্যাটারি সামনে আসছে, সেটা হল সৌর-ব্যাটারি। ইতোমধ্যেই সৌর-ব্যাটারিচালিত রেডিও, ঘড়ি বাজারে ছাড়া হয়েছে। এ-ব্যাটারি তার কাজের জন্য সূর্যের আলোর ওপর নির্ভরশীল, ফলে এর ক্ষয় নেই। শক্তি জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা থাকে বলে সূর্যের আলো যখন পড়ছে না তখনো যন্ত্র চালু থাকে। আমাদের দেশের মতো দেশে এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল।

# অণুবীক্ষণ

প্রাকৃতিক বিশ্বের দিগন্তকে প্রসারিত করা যদি বিজ্ঞানের কাজ হয় তা হলে সরল একটি যন্ত্র বহুকাল ধরে এ-কাজে সহায়তা দিয়ে আসছে। এটি অণুবীক্ষণ। তাই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ছবি যখন আমরা কল্পনা করি তখন অন্তত প্রতীকী অর্থে মনে পড়ে অণুবীক্ষণে চোখ লাগানো একটি মানুষের কথা। ছেলেমেয়েকে অনুসন্ধানী হতে উৎসহিত করার প্রথম প্রয়াসে আমরা তাকে অন্তত একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দেবার চেষ্টা করি যাতে দিগন্ত প্রসারের ব্যাপারটি সে উপভোগ করতে পারে।

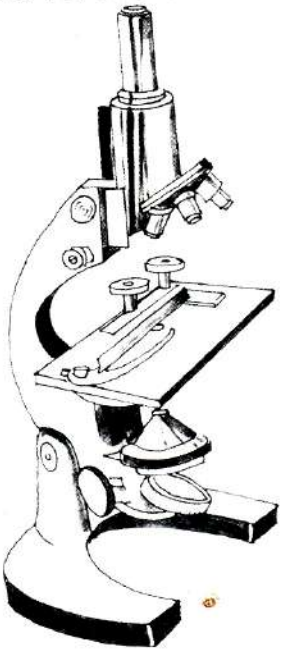

*অণুবীক্ষণ*

অণুবীক্ষণের জন্ম পদার্থবিদ্যার ঘরে, কিন্তু সে চিরকাল ঘর করেছে জীববিদ্যার। আর জীববিদ্যার ঘর করতে নৈপুণ্যের প্রয়োজনেই সে বারবার ফিরে গেছে বাপের বাড়ির শিক্ষার কাছে, পদার্থবিদ্যার নূতন নূতন অবিষ্কারের কাছে। তাই আজ সে এত সুনিপুণা, আরো নৈপুণ্যের প্রচেষ্টা তার আজও অব্যাহত।

অণুবীক্ষণের মূল নিহিত আলোর একটি ধর্ম প্রতিসরণের মধ্যে। এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যেতে আলোর বেঁকে যাবার ক্ষমতা এটি। একটি সাধারণ উত্তল লেন্স এই কারণেই ম্যাগনিফাইং গ্লাস হিসেবে কাজ করতে পারে। যে স্বচ্ছ কাচকে ঘষে মাঝখানে পুরু কিনারায় পাতলা এমন রূপ দেয়া হয়েছে সেটিই উত্তল লেন্স। এর মধ্য দিয়ে আলো এমনভাবে বেঁকে যায় যাতে আলোকরশ্মিগুলো চারিদিক থেকে এসে এক বিন্দুতে অভিসারী হয়। সেই অভিসারের বিন্দুটি যদি আমাদের চোখের কাছে থাকে তা হলে মনে হবে আলোক রশ্মিগুলো যেন অনেক বড় কোনো জিনিস থেকে এসেছে, সত্যিকার যা থেকে এসেছে তার থেকে বড়। এভাবেই একটি উত্তল লেন্সের মধ্য দিয়ে দেখলে ছোট জিনিসকে বড় দেখা যায়, যতগুণ বড় দেখব সেটি হল ঐ লেন্সের বিবর্ধন-ক্ষমতা।

একটি উত্তল লেন্স হয়ে আসা আলো চোখের উপর অভিসারী না হয়ে আর একটি উত্তল লেন্সের কাছে অভিসারী হতে পারে। সেক্ষেত্রে ঐ বিবর্ধিত ইমেজটি দ্বিতীয় লেন্সটি দিয়ে পুনর্বার বিবর্ধিত হবে। সেখানে চোখ লাগালে উভয় লেন্সের বিবর্ধন-ক্ষমতার গুণফলের সমান চূড়ান্ত বিবর্ধন-ক্ষমতা পাওয়া যাবে। আমাদের পরিচিত সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র এমনি অন্তত দুটি উত্তল লেন্স দিয়ে তৈরী। প্রথম লেন্সটি যেটি দ্রষ্টব্য বস্তুর কাছাকাছি থাকে সেটি অবজেক্টিভ বা বস্তু-অংশ আর দ্বিতীয়টি যেটি চোখের কাছে থাকে সেটি আইপিস বা চক্ষু-অংশ। এই দুই অংশে তৈরি অণুবীক্ষণকে যৌগিক ধরনের অণুবীক্ষণ বলা যায়। শুধু একটি লেন্সের যে ম্যাগনিফাইং গ্লাস তাও একরকম অণুবীক্ষণ—সরল অণুবীক্ষণ।

স্কুলের ল্যাবোরেটরিতে শুরু করে অধিকাংশ যে অণুবীক্ষণের সঙ্গে আমাদের পবিচয় তার বিভিন্ন অংশগুলো মোটামুটি একই ধাঁচে তৈরি ও চেহারাটাও মোটামুটি এক। তবে এখানে যেমনটি বলা হল ঠিক তেমন দুটিমাত্র লেন্স থাকে না, আসলে থাকে আরো বেশি। এই অণুবীক্ষণে যা কিছু দেখা হবে তাকে ভেতর দিয়ে কিছুটা আলো চলে যাবার মতো ঈষদচ্ছ হতে হয়—যথেষ্ট পাতলা বস্তুর ক্ষেত্রেই সেটি সম্ভব।

আলোর উৎস হিসেবে বাইরের আলোকে আয়নার সাহায্যে প্রতিফলিত করা যায় বস্তুটির উপর অথবা একটি বাতি থেকেও এর উপর আলো ফেলা যায়। এই আয়না বা বাতিও তাই অণুবীক্ষণের অংশ। ফেলার আগে আলোকে ঘনীভূত করার জন্য কনডেন্সার নামক একটি লেন্স ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয়। বস্তু-অংশে সাধারণত একটি লেন্স থাকে না, থাকে বেশ কয়েকটি—কোনো কোনো অণুবীক্ষণে দশটি পর্যন্ত! একটি বেলনাকার ধাতব নলের মধ্যে লেন্সগুলো সাজানো থাকে। তেমনি চক্ষু-অংশেও অন্তত দুটি লেন্স থাকে। বিবর্ধনের জন্য একটিতেই যেখানে চলে সেখানে একাধিক লেন্স থাকার কারণ অবশ্য আছে। সাধারণ লেন্সের কিছু-কিছু অন্তর্নিহিত ত্রুটি থাকে, যাদের কারণে ইমেজকে ঝাপসা দেখায়, কিছুটা বিকৃত দেখায় এবং এর কিনারায় নানারকম আলোর ঝালর এসে দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে। এসব ত্রুটিকে যথাসম্ভব দূর করার জন্যই অণুবীক্ষণের বস্তু-অংশ বা চক্ষু-অংশে একাধিক লেন্সের প্রয়োজন হয়।

অধিকাংশ অণুবীক্ষণে আবার পুরো বস্তু-অংশই থাকে একাধিক, সাধারণত তিনটি। এদের বিভিন্নটি বিভিন্ন বিবর্ধন-ক্ষমতার—কোনোটি কম কোনোটি বেশি। ঘূর্ণনক্ষম পাতে সংযুক্ত থাকে বলে ঘুরিয়ে এদের যে-কোনো একটিকে বস্তুর উপর আনা যায় এবং বস্তু-অংশ হিসেবে কার্যকর করে তোলা যায়। এভাবে প্রথমে নিম্ন বিবর্ধনে দেখে নিয়ে পরপর উচ্চ বিবর্ধনে যাওয়া যায়। অণুবীক্ষণের ব্যবহারকারীকে আরো একটি কাজ করতে হয়। তা হল বস্তু-অংশকে ওঠানামা করিয়ে চক্ষু-অংশের

সঙ্গে ও বস্তুর সঙ্গে এর দূরত্বে হেরফের ঘটানো। এভাবে ইমেজটিকে দৃষ্টির ফোকাসে আনা যায় এবং একে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

সাধারণ অণুবীক্ষণের বিবর্ধন-ক্ষমতা ১২ থেকে শুরু করে ২০০০ গুণ পর্যন্ত হতে পারে। এর মধ্যে বস্তু-অংশের অবদানটিই বেশি। যেমন, মোট বিবর্ধন ২০০ হলে প্রায়শ দেখা যায় যে, বস্তু-অংশ বিবর্ধিত করে ৫০ গুণ আর চক্ষু-অংশ ৪ গুণ—দুইয়ের গুণফলে ২০০।

ঠিক কে কবে অণুবীক্ষণ আবিষ্কার করেছিলেন সঠিক বলা যাচ্ছে না, তবে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে যৌগিক অণুবীক্ষণ ব্যবহৃত হয়েছে এমন প্রমাণ রয়েছে। বিবর্ধনের জন্য উত্তল লেন্সের প্রচলন অবশ্য তারও পুরোনো কারণ ত্রয়োদশ শতকেও একে চশমায় ব্যবহার করা হয়েছে। গ্যালিলিও দূরবিন নিয়ে তাঁর আবিষ্কারগুলোর জন্য অধিক খ্যাত হলেও তিনিও অণুবীক্ষণকে অবহেলা করেননি। আগেই বলেছি অণুবীক্ষণের ঘরকন্না জীব বিজ্ঞানের সঙ্গেই বেশি। সেই ঐতিহ্যও একেবারে গোড়া থেকে শুরু হয়েছে। গ্যালিলিও লিখেছেন, তাঁর যৌগিক অণুবীক্ষণের ভেতর দিয়ে ছোট্ট একটি মাছিকে প্রায় একটি মুরগির সমান বড় দেখা গিয়েছে।

অবশ্য প্রথম যুগের সব অণুবীক্ষণবিদ যে যৌগিক যন্ত্রটি নিয়ে কাজ করেছেন তাও নয়। ষোলো শতকের শেষের দিকে পর্যন্ত, এমনকি পরবর্তী শতকেও অনেকে সরল অণুবীক্ষণ দিয়ে চমৎকার সব পর্যবেক্ষণ চালিয়ে বিখ্যাত হয়েছেন। লেন্সের ত্রুটির কারণে তখনকার দিনের যৌগিক অণুবীক্ষণগুলোতে বিবর্ধন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্টতাও বাড়ত—তাই উচ্চক্ষমতায় একটি লেন্স ব্যবহার করাই সুবিধাজনক মনে হয়েছে। রবার্ট হুক, মার্চেল্লো মালপিঘি, অ্যান্তনি ভ্যান ল্যাভেন হুক প্রমুখ পথিকৃৎদের হাতে অণুবীক্ষণ জীবজ্ঞানের একটি অত্যাবশ্যকীয় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের অসংখ্য পর্যবেক্ষণে ক্ষুদ্র পোকামাকড়ের দেহে, উদ্ভিদের ক্ষুদ্র অংশে এক-একটি নূতন জগৎ আবিষ্কার হতে আরম্ভ করল। মানুষের দৃষ্টির দিগন্ত দ্রুত বেড়ে চলাতে সহায়ক হয়ে এল অণুবীক্ষণ।

উদাহরণস্বরূপ, ১৬৬৯ সনে মালপিঘি রেশম পোকার উপর যখন তাঁর গবেষণা-পুস্তক প্রকাশ করেন, আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, এই পতঙ্গের কোনো ফুসফুস নেই, এরা শরীরের পাশে অবস্থিত ক্ষুদ্র ছিদ্রের মাধ্যমেই শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে থাকে। মুরগির ভ্রূণে হৃদযন্ত্রের বিকাশ বা প্রাণীর কিডনি বা চর্মের অভ্যন্তরীণ স্থাপত্য আবিষ্কার সে-সময়েই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল অণুবীক্ষণের বদৌলতে। ল্যাভেন হুক যে সরল অণুবীক্ষণগুলো তৈরি করেছিলেন তার অধিকাংশেই থাকত একটি ছোট্ট উত্তল লেন্স যার বিবর্ধন-ক্ষমতা ৩০০ পর্যন্ত হতে পারত। পরে যৌগিক অণুবীক্ষণ ব্যবহার করে এবং লেন্স-ব্যবস্থায় নানাবিধ উন্নতি ঘটিয়ে বিবর্ধন-ক্ষমতা অনেক বাড়ানো সম্ভব হয়েছে বটে কিন্তু দৃশ্য-আলোভিত্তিক এই সাধারণ অণুবীক্ষণে বিবর্ধন-ক্ষমতা সর্বোচ্চ কতটুকু হতে পারে তার একটি ঊর্ধ্বসীমা রয়েছে। অর্থপূর্ণভাবে এই বিবর্ধন-ক্ষমতা আজও ১৪০০ গুণের বেশি হতে পারে না। এর উপরে গেলে দৃশ্য-আলোর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাধ সাধে। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কাছাকাছি দৈর্ঘ্যসম্পন্ন বস্তুর ইমেজে আলোর অপর্বতনের প্রভাব (বস্তুর কিনারায় আলো বেঁকে যাবার ধর্ম) এত প্রকট হয়ে পড়ে যে বিবর্ধিত ইমেজটিকে একটি অস্পষ্ট তালগোল পাকানো জিনিস ছাড়া কিছু মনে হয় না।

তা ছাড়া বিবর্ধন-ক্ষমতাই যে অণুবীক্ষণের একমাত্র জরুরি গুণ নয় তা সেই প্রথম যুগের অণুবীক্ষণবিদরাও জানতেন। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে এর পৃথকীকরণ ক্ষমতা (রিজলভিং পাওয়ার)। এ হচ্ছে বস্তুর মধ্যে খুব কাছাকাছি অবস্থানে থাকা দুটি বিন্দুকে বিবর্ধিত ইমেজে আলাদাভাবে দেখতে পারার ক্ষমতা। পৃথকীকরণ ক্ষমতা কম হলে অধিক বিবর্ধন-ক্ষমতা কোনো কাজে

আসে না। ধরা যাক, ক্ষুদ্র দুটি জীবাণু পরস্পরের খুব কাছাকাছি রয়েছে। এখন স্বল্প বিবর্ধন-ক্ষমতার অণুবীক্ষণে এদের দুটি একে অপরের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটিমাত্র বস্তু মনে হতে পারে। বিবর্ধন বাড়ালে এটাকে আরো বড় দেখা যাবে বটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না পৃথকীকরণ ক্ষমতাও বাড়ানো যাবে ততক্ষণ দুটি জীবাণুকে আলাদা করে দেখা যাবে না, অর্থাৎ আসল বস্তুর সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করা সম্ভব হবে না। অনেক সময় অধিক বিবর্ধিত তালগোল পাকানো ইমেজের চেয়ে বরং স্বল্প বিবর্ধিত সূক্ষ্মভাবে পৃথকীকৃত ইমেজই অধিকতর কাম্য হতে পারে। ল্যাভেন হুকের সরল অণুবীক্ষণে এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের এক ভাগ ব্যবধানে রয়েছে এমন দুটি বিন্দুকে পৃথক করা যেত—অর্থাৎ এর পৃথকীকরণ ক্ষমতা ছিল মিলিমিটারের হাজার ভাগের এক। এখনকার সবচেয়ে ভালো সাধারণ অণুবীক্ষণে এই পৃথকীকরণ ক্ষমতা এক মিলিমিটারের বিশ হাজার ভাগের এক ভাগ।

আসলে পৃথকীকরণ ক্ষমতার এই ঊর্ধ্বসীমায় অণুবীক্ষণ নির্মাতারা প্রায় পৌঁছে গেছেন গত শতাব্দীর মাঝামাঝিতেই। ১৮৭০-এর পর পর জার্মান পদার্থবিদ এর্নস্ট আবে এ-সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব উপস্থাপন করার আগেই অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাতাদের হাতে প্রায় চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ফেলেছিল। শত বছর আগের এসব অণুবীক্ষণের পৃথকীকরণ ক্ষমতা এতই চমৎকার ছিল যে এদের মাধ্যমেই ১৮৬৯ সালে উইলহেলম ক্রাউজ মাংসপেশির তন্তুর সূক্ষ্ম ছবি গ্রহণ করে পেশি সংকোচনের আধুনিক তত্ত্বের পথ প্রশস্ত করেন, আর ১৮৮৭ সালে জন ব্যুস্ট প্রথম বসন্তরোগের ভাইরাস দেখতে পান। তার মানে কি অণুবীক্ষণের জগতে বিংশ শতাব্দীর জন্য কিছুই করার বাকি ছিল না?

তা কিন্তু মোটেই নয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিটি এ-শতাব্দীতে এসে এমন বৈপ্লবিকভাবে বদলে গেছে যে, অনেক ক্ষেত্রে একে আর চেনার উপায় নেই। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটেছে ১৯৩০ সনে এর্নস্ট রুসকার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের উদ্ভাবন। এখানে অনুবীক্ষণের আলোটিই সম্পূর্ণ বদলে ফেলা হল। সাধারণ অণুবীক্ষণ দৃশ্য-আলোর উপর নির্ভরশীল যার বর্ণালিতে সবচেয়ে হ্রস্ব তরঙ্গ হচ্ছে বেগুনি রঙের। খুব ছোট দৈর্ঘ মাপার জন্য যে এংস্ট্রউম একক ব্যবহার করা হয় সেটি হল এক মিলিমিটারের এক কোটি ভাগের এক ভাগ। বেগুনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হল এরকম ৭,৬০০ এংস্ট্রউম একক। আগেই আমরা দেখেছি যে, এই দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি আকারের কোনো ক্ষুদ্র বস্তুকে অণুবীক্ষণ সাধারণ আলো দিয়ে দেখতে চাইলে সেখানে আলোর তরঙ্গধর্মজাত অপবর্তন (ডিফ্রাকশান) এসে বাধ সাধবে। ফলে ইমেজ অস্পষ্ট হয়ে পড়বে।

কিন্তু দৃশ্য-আলোর চেয়েও অনেক ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অদৃশ্য আলো রয়েছে। এ শতাব্দীর প্রথম দিকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব দেখিয়েছে যে, গতিশীল ইলেকট্রন কণিকার সমষ্টি আলোকতরঙ্গের মতো আচরণ করতে পারে এবং উচ্চগতিতে তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক এংস্ট্রউম এককের ভগ্নাংশমাত্র হতে পারে। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মূল কথা হল দৃশ্য-আলোর পরিবর্তে ইলেকট্রনের রশ্মি ব্যবহার। তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক কম বলে নানান বাস্তব সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও ১০ এংস্ট্রউম এককের মতো দৈর্ঘ্যের ক্ষুদ্র বস্তুকেও এতে স্পষ্টভাবে আলাদা করা সম্ভব হয়। দৃশ্য-আলোকে অণুবীক্ষণে বিবর্ধিত করা হয় কাচের লেন্সের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে। ইলেকট্রনকে এরকম লেন্সের মধ্য দিয়ে নিয়ে কোনো লাভ নেই। এর জন্য উদ্ভাবন করতে হয়েছে নূতন ধরনের 'লেন্স' যা ইলেকট্রন রশ্মিকে বাঁকাতে পারে, ফোকাস করতে পারে। ইলেকট্রনের বৈদ্যুতিক চার্জ রয়েছে। তাই যথাযথ চৌম্বকক্ষেত্রে গতিশীল ইলেকট্রনের প্রবাহকে বাঁকাতে পারে। ইলেকট্রনের জন্য ব্যবহার করা হয় এমনি সব চৌম্বক লেন্স। বিবর্ধনের নীতিটি অবশ্য মোটমুটি সাধারণ অণুবীক্ষণের মতোই।

শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রনের দ্বারা বিবর্ধিত অদৃশ্য ইমেজকে দৃশ্য-ইমেজে পরিবর্তন করে নেওয়া চাই। ফ্লোরোসেন্ট অর্থাৎ অনুপ্রভ বস্তুমাখানো পর্দার উপর পড়লে ইলেকট্রনে গড়া এই ইমেজ দৃশ্যমান আলোর ইমেজে পরিণত হয়। অথবা বিশেষ ফটোগ্রাফিক ফিল্মের মাধ্যমেও ইলেকট্রন ইমেজের স্থায়ী ছবি গ্রহণ করা সম্ভব হয়। নীতিটি অভিন্ন হলেও ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের অবয়ব ও চেহারা কিন্তু সাধারণ অণুবীক্ষণের তুলনায় অনেক বেশি জবড়জং। ইলেকট্রনের উৎস, জটিল চৌম্বক লেন্স, বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা এবং সবকিছুকে বায়ুশূন্য পরিবেশে রাখার প্রয়োজনীয়তার কারণেই এটি এই রূপ নেয়। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখতে হলে দ্রষ্টব্য বস্তুটির খুবই পাতলা একটি নমুনা নিতে হয় যাতে করে ইলেকট্রন রশ্মি এর ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারে। এরকম পাতলা নমুনা তৈরি বেশ কৌশলসাপেক্ষ কাজ এবং কয়েক রকমের প্রক্রিয়া এর জন্য রয়েছে।

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ অণুবীক্ষণের পৃথকীকরণ ক্ষমতাকে নিয়ে এসেছে মিলিমিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগে যেখানে সাধারণ অনুবীক্ষণে এটি সীমাবদ্ধ ছিল মিলিমিটারের বিশ হাজার ভাগের এক ভাগে। আর কার্যকর বিবর্ধন-ক্ষমতা যেখানে সাধারণ অনুবীক্ষণে ১৪০০-এর উপর আর বাড়ানো যাচ্ছিল না—ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ এখন বিবর্ধিত করতে পারে ২ লক্ষ গুণের কোঠায়। একে যদি বৈপ্লবিক উত্তরণ না বলা যায় তা হলে বলা যাবে কাকে? বিশেষ করে ভাইরাস, জীবাণু, জীবকোষের আণবিক স্থাপত্য এ-সম্পর্কিত গবেষণায় ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের অবদান অনন্য।

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ এমন শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে আসার অর্থ এই নয় যে দৃশ্যমান আলোর অনুবীক্ষণের জগতে উন্নয়নের পালা শেষ হয়ে গেছে, বরং এর পরবর্তী বড় পদক্ষেপটি আবার এসেছে এই দৃশ্যমান আলোর অনুবীক্ষণের ক্ষেত্রেই। বিজ্ঞানী ফ্রিৎস সেরনিক দেখিয়েছেন যে, জীবকোষের বিভিন্ন অংশে আলোর প্রতিসরণাঙ্ক বিভিন্ন হবার সুযোগ নিয়ে একে অনুবীক্ষণে আরো ভালোভাবে দৃশ্যমান করা সম্ভব। এই আবিষ্কারের জন্য পরে তিনি নোবেল পুরস্কারও লাভ করেছিলেন, কারণ এর ভিত্তিতেই ১৯৪০ সালে কার্ল সাইস প্রথম ফেজ কনট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ অর্থাৎ দশা-সংঘাত অণুবীক্ষণ তৈরি করেন। আজ জীবকোষে বিজ্ঞানের যে-কোনো জার্নাল ওলটালে দেখা যাবে এর অধিকাংশ প্রবন্ধের পরীক্ষণে হয় ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহৃত হয়েছে নতুবা ফেজ কনট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ।

জীববিজ্ঞানী যখন জীবকোষ ইত্যাদিকে অনুবীক্ষণের মধ্য দিয়ে দেখেন তখন একটি বড় সমস্যা হয় নমুনাটির স্বচ্ছতা নিয়ে। যেমন ধরা যাক, একটি এমিবাকে দেখা হচ্ছে। এমিবার দেহ আলোর কাছে এতই স্বচ্ছ, অর্থাৎ এত কম আলো এটি শোষন করে যে, পরিপার্শ্বের থেকে একে ভালোভাবে আলাদা করা মুশকিল হয়ে পড়ে। এজন্য অনেক সময় বিশেষ রং-বস্তু দিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুর বিশেষ অংশকে রাঙিয়ে নেওয়া হয় যাতে করে ওটা সহজে চোখে পড়ে। কিন্তু এতে ওর স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে গবেষক বিজ্ঞানীর কাছে অনেক সময় রাঙানোর ব্যাপারটি অবাঞ্ছিত হয়। ফেজ কনট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ কাজে আসে এমনি পরিস্থিতিতেই—উচ্চ বিবর্ধনে স্বচ্ছ বস্তুকেও স্পষ্ট করে তুলতে বস্তুটির স্বাভাবিকতার কিছুমাত্র পরিবর্তন না ঘটিয়ে।

আলো যখন ঈষদচ্ছ কোনো বস্তুর মধ্য দিয়ে যায় তখন স্বচ্ছতাভেদে কোথাও এটি শোষিত হয় বেশি, সেখানে এর তরঙ্গে উচ্চতা হ্রাস পায় বেশি। তরঙ্গউচ্চতার এই কম বেশি হ্রাস আমাদের চোখে ধরা পড়ে। স্বচ্ছ জিনিসে এই হ্রাস এত নগণ্য হয় যে এটি চোখেই পড়বে না। তরঙ্গউচ্চতা হ্রাসের মতো আরো একটি ব্যাপার ঘটে তা হল এর ফেজ বা দশার পরিবর্তন। দুটি আলোকরশ্মি একই উৎস থেকে এসে যদি পাশাপাশি দুই ভিন্ন ঘনত্বের স্বচ্ছ বস্তুর মধ্য দিয়ে যায় তা হলে এদের কোনোটার

মধ্য দিয়েই এর তরঙ্গউচ্চতা হ্রাস পাবে না। কিন্তু ঘন মাধ্যমের তরঙ্গগুলো অন্য মাধ্যমের তুলনায় একটু পিছিয়ে পড়বে—অর্থাৎ উভয় তরঙ্গমালার দশার মধ্যে পার্থক্য দেখা দেবে। তরঙ্গউচ্চতার পার্থক্যের মতো এ পার্থক্য আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু যদি ধরা পড়ানোর কোনো ব্যবস্থা করা যেত তা হলে স্বচ্ছ বস্তুও তার পারিপার্শ্বিক অন্য স্বচ্ছ বস্তুর পটভূমিতে স্পষ্ট দৃশ্যমান হতে পারত। ফেজ কনট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ দশার এই ব্যবধানকে তরঙ্গউচ্চতার ব্যবধানে পরিণত করে দৃশ্যমান করা হয় সুকৌশলে। ফলে সবই মোটামুটি স্বচ্ছ হওয়া সত্ত্বেও এমিবার শুধু নিউক্লিয়াসটিই নয়, এর চতুর্দিকের প্রোটোপ্লাজমেরও নানা খুঁটিনাটি অনুবীক্ষণে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

ব্যাপারটি বুঝতে হলে পূর্বে উল্লেখিত এর্নস্ট আবের তত্ত্বটি একটু বিস্তারিত দেখতে হবে। অনুবীক্ষণে ইমেজ আমরা কেন দেখি তার ব্যাখ্যা আবে করেছেন এভাবে : দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্য দিয়ে যাবার সময় আলোর একটি অংশ সরাসরি চলে যায়, আর অন্য একটি অংশ এর থেকে নানা দিক বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। প্রথমটি আপতিত অংশ দ্বিতীয়টি অপবর্তিত অংশ। উভয় অংশ ইমেজের মধ্যে আবার মিলিত হয় এবং পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল হয়। দশা ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে আপতিত অংশের তরঙ্গশীর্ষ যদি অপবর্তিত অংশের খাদের সঙ্গে একত্রিত হয় তবে উভয়ে কাটাকুটি হয়ে ইমেজের সে-স্থানে ঔজ্জ্বল্য কম থাকবে। দ্রষ্টব্য বস্তুতে অধিক আলোক শোষণকারী অংশের জন্য এটি ঘটবে বেশি। কম শোষণকারী অংশ থেকে অপবর্তিত আলো কম হবে বলে ইমেজের ঔজ্জ্বল্য সেখানে অধিক বজায় থাকবে— এভাবেই আলো-আঁধারিতে ইমেজটি ফুটে ওঠে। আপতিত ও অপবর্তিত অংশের মধ্যে প্রয়োজনীয় দশা ব্যবধান কমবেশি কাটাকুটি হবার এই সুযোগটি এনে দেয়।

দৃশ্যমান বস্তুটি যদি স্বচ্ছ হয় তা হলে দশা ব্যবধানটি সঠিক পরিমাণে ঘটে না তাই ইমেজও স্পষ্ট হয় না। ফেজ কনট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপে আলোর অপবর্তিত অংশটিকে আলাদা করে এমন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নেওয়া হয় যাতে আপতিত অংশের সঙ্গে এর সঠিক পরিমাণ (অর্ধ তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাণ) দশা ব্যবধান সৃষ্টি হয়। বস্তুর উপর পড়ার আগে আলোকে একটি পর্দার মধ্যেকার রিং আকৃতির ফাঁকের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। লেন্স ব্যবস্থাগুলো এমন থাকে যে, বস্তুর ভেতর দিয়ে যাওয়া আলোর আপতিত অংশটি ঐ রিং আকৃতিতেই বজায় থাকে। আর অপবর্তিত অংশ থাকে রিঙের মাঝখানে বৃত্ত জুড়ে। এখন অনুবীক্ষণের বস্তুঅংশে দুটি লেন্সের মাঝে একটি অপবর্তন প্লেট এমনভাবে রাখা হয় যেন এর ভেতর দিয়ে গমনকালে ঐ দুই অংশের মধ্যে অর্ধ তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাণে দশা ব্যবধান সৃষ্টি হয়। ফলে বস্তু স্বচ্ছ হওয়া সত্ত্বেও ইমেজ স্পষ্ট দৃশ্যমান হয়।

ফেজ কনট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ জীবন্ত জীবকোষের বহুতরো খুঁটিনাটিকে স্পষ্ট জাজ্বল্যমান করে তোলে এর জীবনের প্রক্রিয়াকে কিছুমাত্র ব্যাহত না করে।

হ্রস্বতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অদৃশ্য আলোকে দৃশ্যমান করে তুলতে কোনো কোনো বস্তুর ক্ষমতাকেই বলা হয় ফ্লোরোসেন্স বা অনুপ্রভা। এই আচরণটিকে কাজে লাগিয়ে ঘটেছে অণুবীক্ষণের ক্ষেত্রে একটি সাম্প্রতিক উন্নয়ন ইম্যুনো ফ্লোরোসেন্স প্রক্রিয়া। ইম্যুনো কথাটি এসেছে শরীরের ইম্যুন অর্থাৎ প্রতিরোধব্যবস্থা থেকে। জীবকোষের যে-অংশ বিশেষভাবে দেখতে চাই তার প্রতি সাড়া দেবে প্রতিরোধব্যবস্থার এমনি অ্যান্টিবডিগুলোকে আমরা জাগিয়ে তুলতে পারি। এরা জীবকোষের দ্রষ্টব্য অংশের কাছাকাছি ভিড় করে তাকে অলংকৃত করে রাখবে। এই অ্যান্টিবডির সঙ্গে সুকৌশলে কিছু অনুপ্রভ লেবেল সেঁটে দেওয়া যায়। এখন অণুবীক্ষণের সঠিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অদৃশ্য আলো ব্যবহার করলে অনুপ্রভার কারণে ঐ অংশগুলোর দৃশ্য ইমেজে ফুটে উঠবে। ইম্যুনো ফ্লোরেসেন্ট অণুবীক্ষণের

বিভিন্ন রূপ আজকাল জীববিজ্ঞানীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে জীবকোষের এমন সব সূক্ষ্মতার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যেগুলো আগে অদৃশ্য থেকে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছে এর মাধ্যমে অনুবীক্ষণ বিজ্ঞান আবার একটি বড় উন্নয়নের মধ্য দিয়ে এখন চলেছে।

এমনি আর একটি বড় উন্নয়ন ঘটেছিল আজ থেকে বছর পঁচিশেক আগে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের ক্ষেত্রে। এটি হল স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের উদ্ভাবন। বস্তুর পৃষ্ঠদেশের উপর দিয়ে সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে এটি জীবকোষের উপর আমাদের আণুবীক্ষণিক জ্ঞান দ্রুত বাড়িয়ে দেয়ার আয়োজন করেছে। এরকম অন্তত একটি মাইক্রোস্কোপ ছাড়া কোষবিদ্যার উন্নত কোনো গবেষণার এখন কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সেটি দৃষ্টিক্ষমতা দিয়েছে প্রধানত শুধু পৃষ্ঠদেশের উপর। আজ যে-উন্নয়নের মধ্য দিয়ে অণুবীক্ষণ যাচ্ছে তা উন্মুক্ত করছে জীবকোষের অভ্যন্তরের ত্রিমাত্রিক জগৎকে। শিগ্‌গির জীবতাত্ত্বিক গবেষণাগারগুলোর সবই এরকম ত্রিমাত্রিক দৃষ্টিকে দৈনন্দিন ব্যবহার করতে পারবে এমন আশা এখন করা যায়।

বহু বছর আগে ল্যাভেন হুক প্রমূখদের হাতে অণুবীক্ষণ যে-অন্তর্দৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার অবিশ্বাস্যরকম রূপায়ণে আজ ধন্য হচ্ছেন প্রধানত জীববিজ্ঞানীরা।

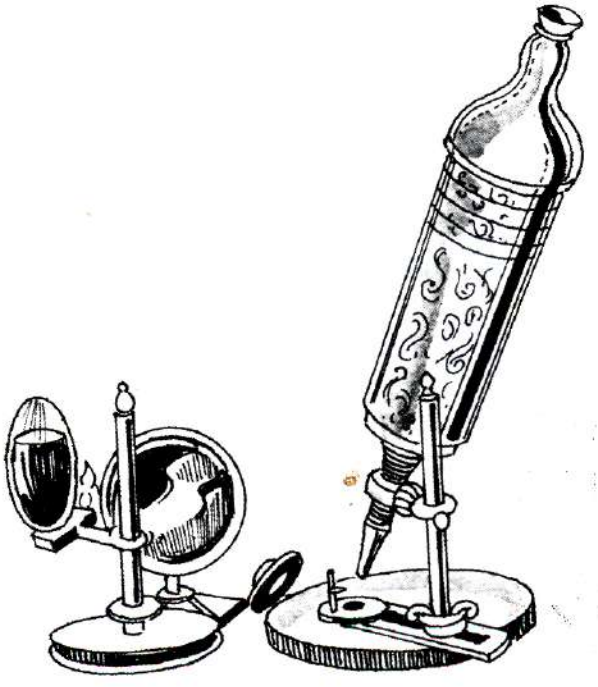

*সপ্তদশ শতকে লিউয়েন হুকের তৈরি মাইক্রোসকোপ পাওয়ার ৩০X*

# খনিজ তেলের কূপ

সিলেটের হরিপুরে তেল পাওয়া গেছে দেশের প্রথম সফল তেলকূপ থেকে। একটিমাত্র কূপ, যে-তেল পাওয়া যাচ্ছে তাকে বেশি বলা যায় না : তবুও এটি হয়তো আরো অনেক বড় সম্ভাবনার দিশারি। আরো বহু উদ্যোগের মাধ্যমে একমাত্র ভবিষ্যৎই সে-সম্ভাবনার পুরো রূপরেখা দিতে পারে। তবুও আজ আমরা কুতূহলী। জানতে চাই কোথা থেকে মাটির নিচে আসলো এ-তেল। কেমন করেই-বা আমরা খুঁড়ি তেলের জন্য এমনি কূপ।

কোটি কোটি বছর আগে সমুদ্রে যে ক্ষুদ্রাকার সব প্রাণী আর উদ্ভিদ থাকত তারই দেহাবশেষ থেকে তৈরি হয়েছে খনিজ তেল। সমুদ্রের তলদেশে তলানি-পড়া এই দেহাবশেষের উপরটা ঢেকে গিয়েছিল স্তরে স্তরে পলির নিচে। উপরের প্রচণ্ড চাপে এবং ভেতরের উত্তাপে কালক্রমে অদ্ভুত কিছু প্রক্রিয়ায় এরা পরিণত হয়েছে তেলে আর গ্যাসে। পরে নিচের সেই পলি কাদা পরিণত হয়েছে কঠিন শিলায় আর তেলটুকুও গিয়ে ঢুকেছে ভূগর্ভের কোনো কোনো শিলাস্তরের ফাঁকে, যেখানে সুযোগ পেয়েছে এই তেল চুইয়ে উপরে উঠে এসেছে, নষ্ট হয়েছে ; কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতীতে মানুষ ব্যবহারও করেছে এরকম চুঁইয়ে-ওঠা তেল—তবে তা অতি সামান্য।

অন্যত্র তেল ভূগর্ভে আটকা পড়ে গেছে কঠিন শিলায় গড়া কিছু-কিছু খাঁচায়। অপ্রবেশ্য শিলাস্তর যেখানে গুম্বজাকৃতি হয়ে একটি কূজের মতো বেঁকে যায় তখন সেখানে তার তলায় তৈরি হতে পারে এমনি তেলের খাঁচা । সাধারণত এমন খাঁচার ভেতরে তেল থেকে যায় যুগ যুগ ধরে—আর তার ঠিক উপরে থাকে খনিজ গ্যাস।

এই তেল-গ্যাস কোথায় এভাবে আটকা পড়েছে তা জানা সহজ নয়। এর জন্য উদ্যোগ নিতে হয় কঠিন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের। সর্বপ্রথম জানতে হয় দেশের সব জায়গার সাধারণ ভূতাত্ত্বিক গঠন। তার পর আরো সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে জানতে হয় কোথায় সঠিক ধরনের শিলা এমন গুম্বজাকৃতি ধারণ করেছে যে তার তলায় তেল-গ্যাসের খাঁচা থাকতে পারে। ভূগর্ভের শিলার জন্য স্থানীয়ভাবে যে অভিকর্ষ বল তার পরিমাপ থেকে শিলাস্তরের বহু জরুরি খবর পাওয়া যায়। তেমনি শিলার চৌম্বকশক্তির সূক্ষ্ম পরিমাপও আমাদেরকে এদের সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করে। অভিকর্ষ পদ্ধতি ও চৌম্বকপদ্ধতি তাই তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজে ব্যবহৃত হয়।

তবে সবচেয়ে কার্যকর এবং বেশি ব্যবহৃত হয় আর একটি পদ্ধতি যা হল সাইসমিক অর্থাৎ ভূকম্প-পদ্ধতি। আমাদের দেশেও এটি নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে অনুসন্ধানের প্রধান পদ্ধতি হিসেবে।

ভূকম্প-পদ্ধতিতে মাটিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কৃত্রিম ভূকম্পের সৃষ্টি করা হয়। বিভিন্ন শিলাস্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসা ভূকম্প-তরঙ্গ উদ্ঘাটিত ও লিপিবদ্ধ হয়। এদের বিশ্লেষণ থেকে শিলাস্তরগুলোর

প্রকৃতি, গভীরতা, বিন্যাস, আকৃতি ইত্যাদি বোঝা সম্ভব। এভাবে অনুসন্ধানে ভূগর্ভে কোথাও তেলের খাঁচা হবার উপযুক্ত শিলাবিন্যাস রয়েছে কি না বোঝা যায় বটে, কিন্তু সে-খাঁচায় তেল বা গ্যাস আদৌ আছে কি না তা নিশ্চিত জানার একমাত্র উপায় হল কূপখনন। অথচ এরকম একটি কূপখনন খুবই ব্যয় ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ ব্যাপার। কূপ খনন করলেই সাফল্য আসে না ; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কূপে কিছুই পাওয়া যায় না অথবা পাওয়া যায় শুধু গ্যাস। কোনো কূপে তেল যদি পাওয়া যায়, তার পরও অনেকখানি অনিশ্চয়তা থেকে যায়। আরো কূপ খনন না করে, পরীক্ষাদি না করে বলা যায় না সেখানে তেলের মজুদ কীরকম, অর্থনৈতিক দিক থেকে এর তাৎপর্য কতখানি।

তেলের কূপ খনন করার সময় প্রথম পদক্ষেপ হল ইস্পাত দিয়ে টাওয়ারের মতো একটি উঁচু কাঠামো গড়ে তোলা যাকে বলা হয় ডেরিক। বলতে গেলে এই ডেরিক তেল উত্তোলনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। খননের সময় লম্বা পাইপগুলো এর সাহায্যে ওঠানো বা নামানো হয়। ডেরিকের নিচে থাকে ঘূর্ণায়মান একটি পাটাতন, এটি চৌকা ফাঁপা একটি নলকে মাটির ভেতরে ঘোরাতে থাকে। এই নলের অগ্রভাগে থাকে খননের হাতিয়ার যা ড্রিল-বিট নামে পরিচিত। ড্রিল-বিট আসলে ধারালো দাঁতের তৈরি ; ধারালো করার জন্য এর সঙ্গে হীরকচূর্ণ মাখানো থাকে। এটি ঘুরতে থাকলে শিলা কাটতে কাটতে নিচের দিকে নেমে যায়, এবং ফাঁপা নলটিকেও নিচে নিয়ে যায়। এদের মাঝখানে তখন যোগ করা হয় গোলাকার ফাঁপা আরো নল যাদের বলা হয় ড্রিল-পাইপ।

ড্রিল-বিট খননের সময় যে-গর্ত সৃষ্টি করে নামে তা ড্রিল-পাইপের চেয়ে আকারে একটু বড় হয়। এ-সময় উপর থেকে ফাঁপা ড্রিল-পাইপের ভেতর দিয়ে নিচে পাঠিয়ে দেয়া হয় একধরনের নরম কাদা। এটি ড্রিল-বিটের কাছে নল থেকে বেরিয়ে নল আর গর্তের দেয়ালের মাঝখানটা দিয়ে আবার উপরে উঠে আসে। এভাবে কাদার সাথে নিচে কাটা পাথরের নমুনা উপরে উঠিয়ে আনা যায়, এবং পাথরের ঘর্ষণে উত্তপ্ত ড্রিল-বিটকে মোটামুটি ঠাণ্ডা রাখা যায়। তা ছাড়া কাদা পাঠাবার আর একটি উদ্দেশ্য হল গর্তের দেয়ালের উপর একটি পলেস্তরা সৃষ্টি করা যাতে সদ্যখোঁড়া পাথর ধসে পড়ে গর্ত বন্ধ হয়ে না যায়।

অবশেষে খাঁচায় নিশ্ছিদ্র আবরণ ভেদ করে কূপ যখন এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন তেল বা গ্যাস পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে। তেল যদি এই স্তরে থাকে তা হলে তা একা থাকে না। তেলের সঙ্গে মিশে থাকে প্রচুর গ্যাস। কাজেই আবরণ ভেদ করার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের চাপে প্রচণ্ড বেগে তেল ও গ্যাস উপরে উঠে আসতে পারে। এ-অবস্থা নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারলে দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। আজকাল পাঠানো কাদার চাপ বাড়িয়ে এটি রোধ করা হয়। গ্যাসের প্রাথমিক চাপ কমে এলে পাম্প করে তেল ওঠাবার ব্যবস্থা করা হয়।

তেলের মজুদের পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য কোনো স্থানে একটি কূপে তেল পাওয়া গেলে আশেপাশের অঞ্চলে পরিকল্পনামতো আরো তেল-কূপ খনন করা হয়। তেল কূপ খনন করার সময় এর অভ্যন্তরের নানা তথ্যাদি উদ্ঘাটন করার মতো যন্ত্রের সাহায্যে এসব তথ্যের একটি নিরবচ্ছিন্ন লেখচিত্র তৈরি করা হয়। একে বলা হয় লগ প্রস্তুত করা। এর থেকে জানা নানা চিহ্ন দেখে নতুন কূপের সম্বন্ধে কিছু-কিছু আন্দাজ করে নেওয়া যায়। বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয় ল্যাবোরেটরিতে। কয়েকটি কূপ থেকে এরকম নানারকম তথ্য পাওয়ার পরেই কোনো এলাকায় যথাযথ তেলক্ষেত্র গড়ে উঠবে কি না বোঝা যায়।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তেল শুধু স্থলভাগেই পাওয়া যায় না। পৃথিবীর তেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখন পাওয়া যাচ্ছে উপকূলের কাছাকাছি সমুদ্রের তলদেশে কূপ খনন করে। স্পষ্টত, এখানে তেলের অনুসন্ধান বা উত্তোলন সহজ নয়। এখানে কূপখননের কাজ করা হয় পানির উপরের প্ল্যাটফর্ম বা পাটাতন থেকে। এখান থেকে ড্রিল-পাইপ নেমে যায় পানির ভেতর দিয়ে সমুদ্রতলে। তাছাড়া এই পাটাতনের উপরেই থাকে আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যবস্থা—এমনকি কুশলীদের বাসস্থান, হেলিকপ্টার নামার জায়গা ইত্যাদিও। কোথাও তেলকূপ খননের কাজ শেষ হলে পাটাতনের পায়া তুলে ফেলে একে পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ভাসমান পাটাতনটি তখন নিয়ে যাওয়া হয় নতুন জায়গায় নতুন কূপ খননের জন্য। যে-কূপে যথেষ্ট পরিমাণে তেল পাওয়া যায় সেখানে গড়ে তোলা হয় নিয়মিত উত্তোলনের জন্য শক্ত স্থায়ী পাটাতন। তেলকূপ থেকে যে-তেল তুলে আনা হয় সেটি অপরিশোধিত তেল। এটি বেশ ঘন একটি ময়লাটে, তরল-হলুদাভ সবুজ থেকে গাঢ় খয়েরি বিভিন্ন রঙের হতে পারে। এই অপরিশোধিত তেল থেকে পরিশোধনাগারে এর বিভিন্ন ভাগ আলাদা করা হয়। এখানে একটি টাওয়ারে তাকে তাকে অনেক ধাতুর পাত্র সাজানো থাকে। এই উচ্চ টাওয়ারের নিচের দিকটা তুলনামূলকভাবে অধিক উত্তপ্ত, উপরটা কম। উত্তাপের এই তারতম্যের জন্য পাতন-প্রক্রিয়ায় নিচের পাত্রগুলিতে জমা হয় হালকা অংশগুলো। তরলকে বাষ্পীভূত করে আবার ঠাণ্ডা করে তরলে পরিণত করাই পাতন-প্রক্রিয়া। তেলের বিভিন্ন অংশের স্ফুটনাঙ্ক বিভিন্ন বলেই এই প্রক্রিয়ায় অংশগুলো আলাদা করা সম্ভব হয়। এভাবেই অপরিশোধিত তেল থেকে আমরা পাই হালকা পেট্রোল এবং তারপর ক্রমান্বয়ে অধিকতর ভারী ডিজেল, পিচ্ছিল কারক তেল, বিটুমিন ইত্যাদি।

# সৌরশক্তি : নানা কৌশল

আমাদের দেশে সৌরশক্তির দক্ষতার ব্যবহার এখুনি হতে পারে, হওয়ার দরকারও। এই শক্তি অবাধে পাওয়া যাচ্ছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুব সহজ কিছু ব্যবস্থা নিয়ে আমরা দৈনন্দিন কিছু দরকারি কাজের জন্য সৌরশক্তি ব্যবহার করতে পারি। নিখুঁত ব্যবস্থা করতে, বা খুব দক্ষভাবে সৌরশক্তি ব্যবহার করতে হয়তো আরো বেশ কিছু গবেষণা প্রয়োজন। কিন্তু সহজ বুদ্ধি প্রয়োগ করে, সস্তায় এই মুহূর্তে যা করা সম্ভব, আমাদের জন্য তাও কম নয়। সৌরশক্তি এমনিতেই পাওয়া যায় এবং তার ব্যবহার সহজসাধ্য বলেই বোধহয় জেনেশুনেও আমরা উদ্যোগ নিই না এর ব্যবহারের। সম্ভাব্য কিছু কৌশলের কথা আলোচনা করলে আমরা নিজেরাই হয়তো কার্যকর কিছু ব্যবস্থা নিজেদের জন্য ভেবে বের করতে পারব।

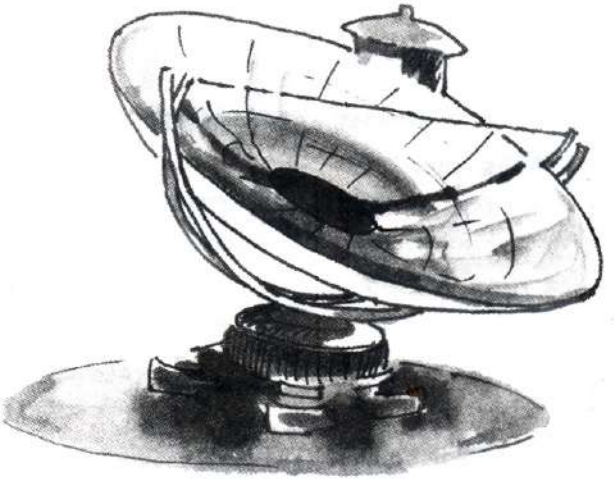

*সৌরশক্তির নানা কৌশল*

**রান্নাবান্না**

রান্নাবান্নার একটা বাড়তি চুলা হিসাবে একটা সৌরচুলা রাখতে পারলে মন্দ হয় না। রান্নার কাজটা রোদের মধ্যে করতে একটু অসুবিধা হবে বইকী। কিন্তু জ্বালানি খরচ বাঁচানোটাও তো কম কথা নয়।

বড় বাটির আকারের একটা প্যারাবোলিক আয়না দিয়ে সূর্যরশ্মি ফোকাস করা হয় হাঁড়িকুড়ির উপর—এটাই সৌরচুলার মূল কথা। আয়নাটা বানানোই হল আসল কাজ। খুব নিখুঁত প্যারাবোলিক বাটির আকৃতিতে আয়না তৈরি করতে হলে আর খুব ভালো প্রতিফলন পেতে গেলে অবশ্য একটু কষ্ট করতে হবে। একটা নিখুঁত বাটির ছাঁচ থেকে অনেকগুলো ধাতুর বাটি তৈরি করে নেয়াই সবচেয়ে সুবিধাজনক। ভালো প্রতিফলক হলে ৪ ফুট ব্যাসের এরকম একটা বাটির সাহায্যে সেরখানেক পানিকে পনেরো মিনিটের মধ্যে ফুটন্ত অবস্থায় আনা যেতে পারে।

অপেক্ষাকৃত চলনসই চুলা বানাতে অবশ্য আরো সহজ উপায় নেয়া যায়। কাঠের ফ্রেম করে নিয়ে তাতে ধাতুর পাত লাগিয়ে তৈরি হতে পারে বাটি। বাটির আকারের ফ্রেমের উপর ছোট ছোট কাচের সমতল আয়না পাশাপাশি সাজিয়েও তৈরি হতে পারে প্রতিফলক। বেতের ঝুড়ির ভেতরে মাটি লেপে নিয়ে তাতে রাংতা লাগিয়ে কেউ-কেউ তৈরি করেছেন এরকম বাটি। আবার মাটির মধ্যে মোটামুটি প্যারাবোলিক আকৃতির গর্ত খুঁড়ে তাতে রাংতা সাজিয়েও একরকম সৌরচুলা তৈরি হয়েছে। আপনার সুবধিামতো আপনিও একটা-কিছু তৈরি করে নিতে পারেন বাড়তি চুলার জন্য। বুঝতেই পারছেন বাটিটা মুখ করে থাকতে হবে সূর্যের দিকে আর রান্নার হাঁড়িটা চাপাতে হবে মোটামুটি বাটির ফোকাসে। একবার ফোকাসটা ঠিক করে নিয়ে একটা কাঠির সাহয্যে সেখানে বাটি বসাবার ব্যবস্থা রাখতে পারেন। যেভাবেই বানান, প্রতিফলক বাটিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে রাখার ব্যবস্থা থাকা দরকার। আপনি নিজে যদি এটা বানাবার ব্যবস্থা করেন, তা হলে ব্যবহার করতে করতে নিজেই বুঝবেন সুবিধা-অসুবিধা কী কী হতে পারে। কেউ উদ্যোগ নিয়ে অপেক্ষাকৃত নিখুঁত সৌরচুলা বাজারে ছাড়লেও খুব ভালো কাজ হয়।

### ওভেনের কাজ

রান্নাবান্নায় ওভেনের ব্যবহার আমাদের দেশে কম। তবে রুটি তৈরিতে, প্যাটিস ইত্যাদি গরম করতে, আর খাবার রাঁধতে ওভেন কাচের জানালাওয়ালা একটা বাক্স হলেই হল। বাক্সটা তিনদিকে তাপ অপরিবাহী জিনিসে ঢাকা হলে ভালো হয়, আর ভেতরটা কালো রঙে রং করা হলে। কাচের জানালা দিয়ে সূর্যরশ্মি অবাধে বাক্সে ঢুকতে পারে। বাক্সের ভেতরটা এবং ভেতরে রাখা খাবারদাবার এই রশ্মিতে গরম হয়। কিন্তু এর থেকে বিকীর্ণ তাপ বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বলে কাচের ভেতর দিয়ে অতটা বেরিয়ে যেতে পারে না। তাপটা ভেতরেই জমে। কাচের জানালার চারিদিকে চারটা বড় বড় সমতল প্রতিফলক তেরচা করে লাগালে আরো বেশি সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে এই জানালার উপর পড়তে পারে। বাক্সের ভেতরের কালো রং তাপ শোষণ করতে সাহায্য করে। ঠিকমতো তৈরি হলে দুশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেরও উপর তাপ বাক্সের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে, আর নানা কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

### গরম পানি

সূর্যের তেজে ছাদের ওপর পানির ট্যাংক গরম হয়ে বা পানির পাইপ গরম হয়ে এমনিতেই গরম পানি পাওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। গভীর ট্যাংকের বদলে পানিটাকে যদি সূর্যের আলোতে অপেক্ষাকৃত ছড়িয়ে রাখা যায় তা হলে গরম পানি আরো ভালোভাবে বেশি পরিমাণে পাওয়া সম্ভব। তখন শুধু শীতকালে আরামে গোসল করতেই নয়, রান্নাবান্না, ধোয়া-মোছার কাজে ও বেশ গরম পানি ব্যবহার করে জ্বালানি খরচ আমরা অনেক কমিয়ে ফেলতে পারি।

সূর্যের তাপে পানি গরম করতে খোলা জায়গায় কালো রঙের একটা অগভীর পানির পাত্র বা আঁকাবাঁকা কালো রঙের পানির পাইপই যথেষ্ট। অবশ্য শুধু এভাবে তৈরি হলে বিকিরণের ফলে এবং বাতাসের পরিচালনের ফলে অনেকখানি তাপ নষ্ট হবে। ওভেন-তৈরিতে যে-কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে এখানেও তা চলতে পারে। কাচ বা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের আবরণে পানির পাত্রকে ঢেকে দিলে বিকিরণ ও পরিচলনে তাপ নষ্ট হতে পারবে না। এভাবে গরম পানি পাওয়ার জন্য আমরা বাড়ির ছাদে কিছু-একটা ব্যবস্থা করতে পারি। গরম হবার সুযোগ দিয়ে পানিধারণের নানারকম ব্যবস্থা হতে পারে। কালো প্লাস্টিকের থলের মতো জিনিস হতে পারে এটা। আঁকাবাঁকা পাইপের আকারে হতে পারে, ঢেউটিনের সাথে একটা সমতল লোহার পাত লাগিয়ে নিয়েও সস্তা একটা হিটার তৈরি হতে পারে। ঢেউটিনের সমান্তরাল খাঁজগুলো তখন পানিধারণের কাজ করবে। যেভাবেই তৈরি হোক না কেন তাপশোষণের এই ব্যবস্থাটা তেরচা করে রাখতে হবে ভালো সূর্যতাপ পাওয়ার জন্য, আর রাখতে হবে কাচ বা স্বচ্ছ প্লাস্টিকে ঢাকা অবস্থায়, অন্য সব দিক তাপনিরোধী করে।

কোন দিকে কতখানি কাত করে রাখা উচিত পানির সৌর-হিটারকে? সবচেয়ে সহজ হিসেব হল বিষুবরেখা যেদিকে সেদিকে ঐ জায়গায় অক্ষাংশের সমান কোণ করে তেরচা করে রাখা। ঐ অবস্থাতেই সবচেয়ে বেশি সূর্যকিরণ পাওয়ার সম্ভাবনা। বুঝতেই পারছেন, হিটারের মধ্যে একসাথে বেশি পানি যাবে না। তাই গরম-হয়ে-যাওয়া পানির জন্য মোটামুটি তাপনিরোধী একটা সংরক্ষণ-ট্যাংকের ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না। এর একটা সহজ পদ্ধতি হল হিটার থেকে দু'ফুটের মতো উঁচুতে এর সাথে সংযুক্ত একটি ট্যাংক ব্যবহার করা। গরম-হয়ে-যাওয়া পানি অপেক্ষাকৃত হালকা বলে তা আপনাআপনি সংরক্ষণ ট্যাংকের মধ্যে চলে যেতে থাকবে, আর নূতন ঠাণ্ডা পানি হিটারে আসবে।

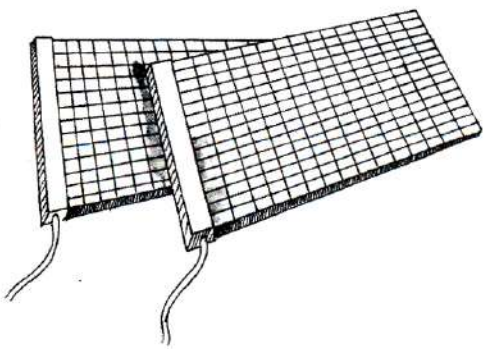

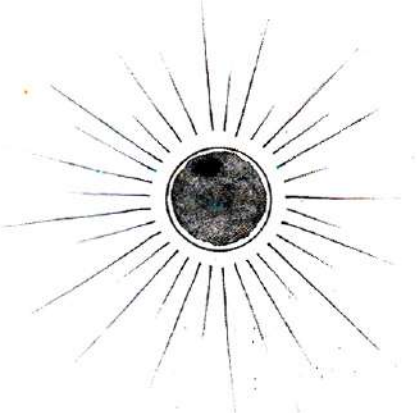

*সৌরশক্তি : নানা কৌশল*

**শস্য-সবজি-মাছ শুকানো**

কৃষিব্যবস্থার শুরু থেকেই শস্য শুকাবার জন্য রোদের তাপ ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের দেশে তো শস্য শুকাবার এটাই একমাত্র ব্যবস্থা। উঠানে ছড়িয়ে ধান শুকাবার কাজটা একটু ভালোভাবে করা যায় যদি কালো রঙের চ্যাপটা পাত্রের ওপর পলিথিনের স্বচ্ছ ঢাকনির ব্যবস্থা করা হয়। এতে অতিরিক্ত তাপ আটকিয়ে ধান তাড়াতাড়ি শুকানো যেতে পারে—তা ছাড়া পাখি, বৃষ্টি এদের হাত থেকেও রক্ষা পেলো। অল্প জায়গায় বেশি ধান শুকাবার জন্য সরাসরি রোদে না শুকিয়ে রোদে-গরম-হওয়া বাতাসেও তা শুকানো যায়। এভাবে গরম হওয়া বাতাসে আর্দ্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকে বলে এটা

তাড়াতাড়ি ধানের আর্দ্রতা শুষে নিতে পারে। বেশ খানিকটা জায়গা স্বচ্ছ পলিথিনে ঢেকে সেখানকার বাতাস রোদে গরম করে নেয়া যায়। গরম বাতাস একটা চিমনির মতো নল দিয়ে এসে একটা ঢাকা পাত্রে রাখা ধানকে শুকাতে পারে। এভাবে শুকানোর একটা বড় সুবিধা হল এতে সব ধানে তাপ সমানভাবে লাগে।

রাখাঢাকা অবস্থায় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে নিতে পারলে নানা ধরনের ফল ও সবজিকে অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায়। রোদে শুকিয়ে তুলে রাখার নিয়ম আমাদের দেশে আজকের নয়। কিন্তু উল্লিখিত কৌশলগুলো ব্যবহার করে আরো ভালোভাবে, বীজাণুমুক্ত অবস্থায় কাজটা করা যায়। মাছ শুকিয়ে শুঁটকি করে সংরক্ষণ করা আমাদের একটা প্রচলিত ব্যবস্থা। মাছের মূল্যবান আমিষের অনেকখানি শুঁটকিতেও সংরক্ষিত থাকে, তা ছাড়া এর স্বাদটাও অনেকের পছন্দ। কিন্তু খোলামেলা শুকাতে গিয়ে অনেক শুঁটকি নষ্ট হয়, ধুলাবালি, বীজাণুতে আক্রান্ত হয়। একই প্রক্রিয়ায় পলিথিনের তাঁবুর মধ্যে শুঁটকি স্বাস্থ্যসম্মত ও দক্ষভাবে শুকানো যায়। এসব ব্যবস্থার খরচটাও তেমন কিছু নয়।

### পাম্প চালাবার ইনজিন

সেচের জন্য ছোট ছোট পাম্প চালানোটাই বোধহয় আমাদের দেশে সৌরশক্তির সব-চাইতে সম্ভাবনাময় ব্যবহার হতে পারে। সাধারণ বাষ্পীয় ইনজিন দিয়ে এই পাম্প চালানো যায়, যেখানে বয়লারে বাষ্পটা তৈরি হবে সৌররশ্মি প্রতিফলকের সাহায্যে—যেভাবে সৌরচুলার কেতলির পানি ফুটানো হয়েছে। আরো সহজ ব্যবস্থা করতে হলে এভাবে তৈরি বাষ্প দিয়ে একটা সরল টারবাইন বা ফুরফুরি ঘোরানো যায়—যা পাম্প চালাবে। সহজ নিজস্ব কারিগরিতেই এরকম টারবাইন বানানো যেতে পারে।

### ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা (রেফ্রিজারেটর)

সৌরতাপ জিনিসপত্র তাতানোর কাজে লাগে, তা আবার ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থায় কী কাজে আসে? আসে বইকী। নীতিগতভাবে প্রক্রিয়াটাও কঠিন নয়, যদিও এখনো সস্তাভাবে তৈরি করা যাচ্ছে না।

এর একটা সহজ উপায় হল 'শোষণ ও পরিত্যাগ' পদ্ধতি। অ্যামোনিয়ার মতো সহজে বাষ্পীভূত হয় এমন একটা তরল নিয়ে এটা করা যায়। এতে অ্যামোনিয়ার দুটি প্রবাহ থাকবে। একটা প্রবাহ হবে বিশুদ্ধ তরল ও গ্যাসীয় অ্যামোনিয়ার। আর একটা প্রবাহ হবে লবণগোলা ঘন তলে অ্যামোনিয়ার দ্রবণের। সূর্যতাপে দ্রবণ থেকে অ্যামোনিয়া পৃথক করে নিয়ে এই গ্যাসীয় অ্যামোনিয়া আর একটা পাত্রে ঠাণ্ডা করে তরল করে নেয়া হয়। সেই তরল অ্যামোনিয়া বাষ্পীভূত করার ব্যবস্থা হয় তাপে অপরিবাহী বাক্সের ভেতর। বাষ্পীভূত হবার সময় তাপ নিয়ে নেয় বলে সেই বাক্সে উত্তাপ কমে যায়। এই বাষ্পীভূত অ্যামোনিয়াকে বাইরে নিয়ে সাধারণ তাপে আবার দ্রবণের মধ্যে মিশিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয় পুনরায় সূর্যতাপে গরম হতে। সেখানে এটা আবার অ্যামোনিয়া ছেড়ে দিয়ে প্রক্রিয়াটি চালু রাখে।

একদিন হয়তো খাবারদাবার ঠাণ্ডা রাখতে, এমনকি ঘর ঠাণ্ডা রাখতে আমরা গরমের জন্য দায়ী জিনিস সেই সূর্যকেই সবাই ব্যবহার করব।

### সৌরব্যাটারি

এতক্ষণ সূর্যতাপের যতগুলো ব্যবহারের কথা বলা হলো সবই সরাসরি ব্যবহার। আর এক ধরনের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও বহুল সম্ভাবনাময়, তা হল সৌরব্যাটারির কৌশলে সূর্যতাপকে বিদ্যুৎ

উৎপাদনের কাজে লাগানো। সেমিকন্ডাকটর বা অর্ধপরিবাহী সিলিকন ইত্যাদি দ্রব্যের কতগুলো বিশেষ গুণের জন্য এরকম সৌরব্যাটারি তৈরি সম্ভব হচ্ছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এখনো এই দ্রব্যগুলো যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়ে সৌরব্যাটারি তৈরির গবেষণা যদিও ব্যাপকভাবে চলছে, আমাদের দেশে অদূর ভবিষ্যতে এরকম সৌরব্যাটারী অধিক পরিমাণে তৈরির সম্ভাবনা কম। তাই বর্তমানে সর্বজনীন ব্যবহারের জন্য সরাসরি সূর্যতাপ গ্রহণের উপরেই আপাতত আমাদের জোর দিতে হবে।

শেষ করার আগে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই যে, সরাসরি সূর্যতাপে গরম করার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই তাপ-সংরক্ষণের ব্যবস্থাটাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই ব্যবহার্য অনেক কৌশলেই তাপ-অপরিবাহী ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সহজে যেসব দ্রব্য এ-কাজে সহায়ক হতে পারে তারা হল অপরিবাহী গুণের ক্রম অনুসারে কর্ক, কাঠের গুঁড়া, অ্যাসবেসটস, কাগজ, সিমেন্ট, বালি ও ইট। সৌরতাপ ব্যবহারের মালমশলা আমাদের হাতের কাছেই আছে। সত্যিকার কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার শুরু হওয়াটাই এখন বড় কথা।

### কলে কারখানায় রোবট-শ্রমিক

সায়েন্স ফিকশন গল্পের পাতায় পাতায় রোবটরাজ্যের বহু কাহিনী আমরা অনেকদিন ধরে দেখে আসছি। কিন্তু রোবট এখন শুধু সায়েন্স ফিকশনেই নেই, ল্যাবোরেটরির শৌখীন গবেষণায়ও শুধু এটি নেই—এটা এখন কলে-কারখানায় শ্রম দিচ্ছে। একটি দুটি নয়, ক্রমেই অনেক অনেকগুলো রোবট এখন তৈরি হয়ে কলে-কারখানায় শ্রমিকের কজে যোগ দিচ্ছে। এর নানান দিক নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠছে।

আজ কোনো কোনো দেশের কারখানার যে-ছবি আমরা দেখছি তাকে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করলে আমরা কী পাই? অনেকগুলো সস্তা, কর্মঠ রোবট ভাবলেশহীনভাবে একটানা কাজ করে যাচ্ছে; তাদের তদারকি করছে বিচক্ষণ কেন্দ্রীয় কম্পিউটার। মানুষও অবশ্য আছে ব্যবস্থাপনায়, কিন্তু তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় অনেক কম। রোবট-শ্রমিকরা প্রয়োজনানুসারে দেখবে, শুনবে, স্পর্শ করবে, কথা বলবে এবং তাদের উপর ন্যস্ত বিশেষ বিশেষ কাজ কুশলতার সাথে একনাগাড়ে করে যাবে। এক হিসেবমতো ইতিমধ্যে পৃথিবীর নানা দেশের কারখানায় এরকম হাজার হাজার রোবট কাজ করছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে এই রোবট জনসংখ্যায় একটি বিরাট রকমের বিস্ফোরণ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বর্তমান দু'একটা রোবট-শ্রমিকের দিকে তাকানো যাক। খুব দক্ষ একধরনের রোবট-শ্রমিক সম্প্রতি তৈরি হচ্ছে! প্রধানত জেনারেল মোটরস কোম্পানির প্রয়োজনে পুমা নামের (PUMA : Programmed Universal Manipulator for Assembly) রোবটটি তৈরি হয়েছে। মোটরগাড়ির অ্যাসেম্বলি লাইনে দাঁড়িয়ে এই ছোট রোবটটি কুশলী শ্রমিকের মতো বিভিন্ন পার্টস সংযোজন করবে। কিন্তু পুমা আরো অনেক কিছুই করতে সক্ষম—কারণ বিভিন্ন কাজের উপযোগী করে তাকে প্রোগ্রাম করা যায়। উদহরণস্বরূপ, অস্ট্রেলিয়ার অসংখ্য ভেড়ার গা থেকে পশম ছেঁটে নেবার কাজে তাকে শিগ্‌গির ব্যবহার করা হবে। অস্ট্রেলিয়ার প্রায় দশ হাজার শ্রমিক বর্তমানে এ-কাজে নিযুক্ত আছে এবং এ-পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটা করার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু পুমার পক্ষে এটা সম্ভব।

আসলে সায়েন্স ফিকশন ছবিতে আমরা রোবটের যে মানুষসদৃশ চেহারা দেখতে অভ্যস্ত পুমা সেরকম কিছু নয়। স্থির কাঠামোতে বাহুসর্বস্ব দেহ এর—দেখতে কতকটা ঘাসফড়িং-এর মতো।

জবড়জং কিছু এরা মোটেই নয় ; বরং ছিমছাম দেহ—দরকারমতো কিছু হাত, ব্যস। কোনো মডেলে ঐ হাতে থাকে আঁকড়ে ধরার ব্যবস্থা জিনিসপত্র তোলার জন্য, কোনোটাতে থাকে রঙের স্প্রে-মেশিন যা তাকে চিত্রকরে পরিণত করে, কোনোটাতে থাকে আর্ক বাতি যা তাকে কুশলী ওয়েল্ডারে পরিণত করে—ইত্যাদি।

শ্রমিক-রোবট শুধু যান্ত্রিক কাজ করে না, তৈরি জিনিসের পরিদর্শনও সে করতে পরে। টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্ট ক্যালকুলেটর তৈরির একটা বড় কোম্পানি। সেখানে বেশকিছু কমপিউটার-নিয়ন্ত্রিত রোবট কনভেয়ার বেল্টের উপর চলমান কালকুলেটরকে তার টিভি ক্যামেরার চোখে দেখে হাতে তুলে স্বয়ংক্রিয় নিরীক্ষাযন্ত্রে স্থাপন করে। এভাবে প্রত্যেকটি ক্যালকুলেটরের উপযুক্ততা যাচাই হয়।

রোবট-শ্রমিকের সুবিধাগুলো কী? একঘেয়ে, বিপজ্জনক কাজে মানুষ-শ্রমিকের অনীহাগুলো তার মধ্যে নেই। ফলে যে-কোনো রকমের আপত্তি ছাড়া দিনের পর দিন এগুলো কাজ করে যেতে পারে। শারীরিক, মানসিক অবসাদ নেই বলে দৈনিক তিন শিফ্‌ট্‌ কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। তা ছাড়া রোবটের কাজ করার গতিও সবসময় একই থাকে। রোবটের ব্যবহারের ফলে দেখা গেছে যে উৎপাদন তো অনেক বেড়ে যাচ্ছেই, সেরকম নিম্ন-মানের জিনিসের উৎপাদনও অনেক কমে যাচ্ছে। কাজের পরিবেশ যেখানে দুঃসহ—যেমন ভ্যাপসা গরম চুল্লির কাছে বা দুর্গন্ধ গ্যাসের পরিবেশে, রোবট-শ্রমিকের কিছু আসে যায় না।

সবচেয়ে বড় সুবিধাটা অবশ্য বেতনের দিক থেকে। শিল্পোন্নত দেশে শ্রমিকের মজুরী যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে রোবটের শ্রম অনেকের জন্য সস্তা পড়ছে। এতে শিল্পপতির যে লাভ হয় তার একটা উদাহরণ নেয়া যাক। গুডইয়ার টায়ার কোম্পানির একটা কারখানায় দুই শিফ্‌টে দু'জন করে মহিলা-শ্রমিক নিয়োজিত ছিলেন টায়ারগুলোকে গড়িয়ে এক লাইন থেকে অন্য লাইনে নিয়ে যেতে। এখন ২৩,০০০ ডলার মূল্যের একটা রোবট পুরো কাজটা করবে। এতে নাকি প্রতি বছর বেতন হিসেবে ২৮,০০০ ডলার কোম্পানির বেঁচে যাচ্ছে এই বিশেষ জায়গায়।

জটিল যন্ত্রপাতি সংযোজনের কাজে রোবটের ব্যবহার দিন-দিন বেড়ে চলেছে। এজন্য এদেরকে যথারীতি কমপিউটার প্রোগ্রামের নির্দেশ দিয়ে রাখতে হয়। যেমন 'পুমা'র ক্ষেত্রে একটি কমপিউটার কী-বোর্ডে চাবি টিপে বিশেষ কোনো সংযোজন কর্মধারার নির্দেশ দিয়ে দিতে হয়। একশোটি ইংরেজি শব্দের সমন্বয়ে বিশেষ একটি কমপিউটার-ভাষা এরজন্য ব্যবহার করতে হয়। এমন রোবটও রয়েছে যা ১৭টি আলাদা আলাদা অংশ ঠিকঠাক সংযোজন করে ডাইনামো মোটরের মতো যন্ত্র তৈরি করতে পারে সম্পূর্ণ একাকী।

রোবটের ক্ষেত্রে অবশ্য বেশকিছু সমস্যা আছে যেগুলো মানুষ-শ্রমিকের নেই। যেমন ধরা যাক স্তূপ করে রাখা নানা যন্ত্রাংশের মধ্য থেকে দরকারি জিনিষটা তুলে নেয়া। এক সমতলে ছড়িয়ে রাখলে রোবটের কৃত্রিম চোখে তা ঠিক ধরা পড়বে, কিন্তু স্তূপ করে রাখলে অতি কঠিন ব্যাপার রোবটের জন্য। অথচ মানুষের জন্য তা কোনো সমস্যাই নয়। দুটো কাছাকাছি মাপের জিনিসকে একটার মধ্য দিয়ে আরেকটা চালিয়ে দেয়ার কাজ রোবটকে দিয়ে করাতে হলে অনেক কিছু দরকার। ডায়নামো সংযোজনের কাজে দেখা গেছে যে, রোবটের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজটি হল ভেতরে একটি বিয়ারিং পরিয়ে দেয়া। জাম না হয়ে, আটকে না গিয়ে কীভাবে এটা সম্ভব তার জন্য বিজ্ঞানীদেরকে বছরের পর বছর বিশ্লেষণ করতে হয়েছে। অথচ মানুষ-শ্রমিক এটা 'অবলীলাক্রমে করে। হাতের, চোখের সংবেদিতা আরো অনেকখানি না বাড়ালে রোবটের পক্ষে মানুষ-শ্রমিকের সব কাজ করা সম্ভব নয়।

'পুমা'র নির্মাণকারী প্রতিভাবান কুশলী ভিক্টর সাইনম্যানের মতে রোবট-শ্রমিকের হাত এমন সংবেদী করে তুলতে হবে যে এটা এই মুহূর্তে একটা ডিম তুলে নেবে ভেঙে না ফেলে আর পর মুহূর্তে একটি সিসার ইট তুলে নেবে তাকে পড়তে না দিয়ে।

রোবট-শ্রমিকের ক্রমবিস্তারে সবচেয়ে আশঙ্কিত যাঁরা, স্বাভাবিকভাবেই তারা হলেন মানুষ-শ্রমিক। ব্যাপক একটা বেকারসমস্যার সম্ভাবনায় তাঁরা ভীত হয়ে উঠছেন। ১৯৫০-এর দিকে শিল্পকারখানায় স্বয়ংক্রিয়তার প্রবণতা দেখা দিলে যে বেকারসমস্যার সূত্রপাত হয়েছিল এবং সত্তরের দশকে উন্নত বিশ্বে যেটা চরম রূপ লাভ করেছে এই নূতন সমস্যা তার চেয়েও ভয়াবহ হতে বাধ্য। সেই স্বয়ংক্রিয়তার বলি হয়েছিল প্রধানত অদক্ষ শ্রমিকেরা। আর ভবিষ্যতের রোবট-শ্রমিকের তাড়া খেয়ে কর্মচ্যুত হবে দক্ষ অদক্ষ সবাই। কারণ রোবট-শ্রমিক দক্ষ শ্রমিকের চেয়ে কম যায় না।

বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নগুলো তাই ইতিমধ্যেই অস্থিরতা প্রকাশ করেছে রোবট-শ্রমিকের আগমনে। প্রথম দিকে মানুষ-শ্রমিকের কাজ ধীরে ধীরে তদারকির কাজ পর্যবশিত হবে— আসল কাজ করবে রোবট-শ্রমিক। এভাবে যেতে থাকলে রোবটই রোবট-শ্রমিকের তদারকি কাজ তো বটেই রোবটেই রোবট বানাতেও শুরু করবে, যে-রকম অবস্থায় বর্তমানের ৫০,০০০ ডলার দামের একটা রোবটের দাম কমে গিয়ে ২,০০০ ডলারে পরিণত হতে পারে। এমন একটা সস্তা রোবটের কার্যকর মজুরি ঘণ্টায় মাত্র ৭০ সেন্টে নেমে আসবে! এর সাথে মানুষ-শ্রমিক পাল্লা দেবে কী করে?

সবাই অবশ্য ব্যাপারটা এই দৃষ্টিতে দেখছেন না। রোবট-শ্রমিকের উন্নয়নে জড়িত অনেকের মতে রোবট-শ্রমিক শেষ অবধি খুব বেশি লোককে কর্মচ্যুত করবে না। বেশিরভাগ কাজই মানুষের হাতে থাকতে বাধ্য। দেখা যাবে রোবট-শ্রমিক পশ্চিমা বিশ্বের মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ লোককে কর্মচ্যুত করেছে। হাজার হলেও রোবট-শ্রমিকের প্রতিযোগী অত্যন্ত শক্তিশালী—তার নাম মানুষ।

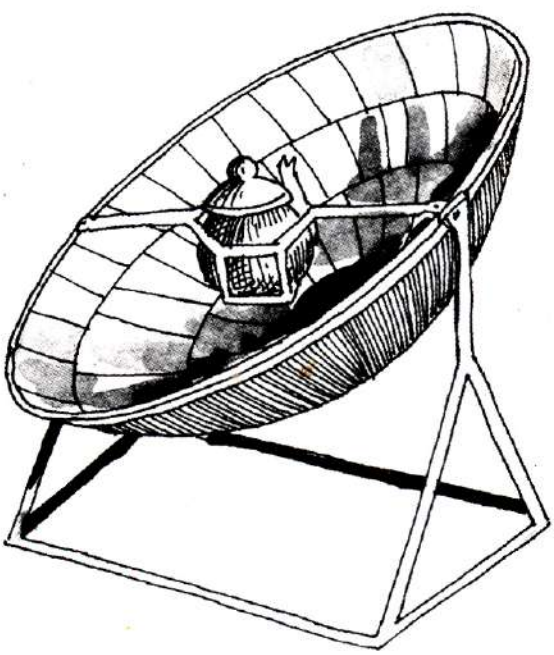

*সৌরশক্তি : নানা কৌশল*

ISBN 984 410 280 4